অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

১. বড়দের ছেলেবেলা
২. ফেরেশতাদের বিস্ময়কর জীবনকথা
৩. আখেরাতের পাথেয় (মাওয়ায়েযে আবরার-১)
৪. আদর্শ জীবন গঠনের ইসলামী পদ্ধতি (মাওয়ায়েযে আবরার-২)
৫. আমাদের অধঃপতন ও উত্তরণের পথ (মাওয়ায়েযে আবরার-৩)
৬. আহকামে যাকাত
৭. ইসলাহী মাজালিস (২য় খণ্ড)
৮. মাজালিসে আবরার
৯. রাসায়েলে আবরার
১০. বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতা
১১. বিষয় ভিত্তিক প্রবন্ধ
১২. সহীহ হাদীসের আলোকে নামায
১৩. আহকামে সফর
১৪. শিয়া মতবাদ ইরানী বিপ্লব ও ইমাম (?) খোমিনী
১৫. বিনয় : সম্মান ও মর্যাদার সোপান
১৬. কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ
১৭. তোমার লীলাই দেখতে পাই (কবিতামালা)
১৮. বিষয় ভিত্তিক বয়ান
১৯. বিষয় ভিত্তিক মাসআলা-মাসায়িল
২০. ছোটদের ইসলামী কাহিনী
২১. মালফূযাতে ফুলপুরী
২২. মাআরিফে মাসীহুল উম্মাত
২৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) কি নূরের তৈরী?
২৪. মালফূযাতে ফকীহুল উম্মাত
২৫. আত তাকসীমুস সাবয়ী (আরবী পুস্তিকা)
২৬. ইরশাদাতে গাঙ্গুহী
২৭. ইরশাদাতে আকাবির
২৮. মাজালিসে সিদ্দীক
২৯. ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম
৩০. ধূম্রজালে জিহাদ

মূল কিতাবের প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের যিন্দেগী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শেরই প্রতিচ্ছবি। তাঁদের বরকতময় মজলিসগুলোতে ঐ আদর্শের অনুসরণের দীক্ষা দেয়া হয়। এই হযরতদের মালফূযাত বা মুখনিঃসৃত অমূল্য বাণীসমূহ দিলের দুনিয়ায় প্রভাব সৃষ্টি করে। এবং সৌভাগ্যবান মানুষের জীবনে মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যায়। এ জন্যই যুগে যুগে বুযুর্গানে দ্বীনের মালফূযাতকে কাগজের বুকে সংরক্ষণ করার ধারাবাহিকতা চলে আসছে। যা পরবর্তীকালের মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে দারুণ সহযোগী প্রমাণিত হয়েছে।

হযরত শাইখ মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. নিকট অতীতের ঐ সব আল্লাহওয়ালাদের একজন, যাঁর বরকত পরশিত সান্নিধ্যে বহু মানুষ ফয়েয হাসিল করেছেন। এবং বাতেনী তারবিয়্যাত বা আধ্যাত্মিক দীক্ষা অর্জন করেছেন। তাঁর সাথে সম্পৃক্ত মানুষের সংখ্যা লাখের কোটা ছাড়িয়ে গেছে।

ইমামুল আসর হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর খাস শাগরিদ এবং হযরত শাইখ রায়পুরী রহ. এর খলীফায়ে মুজায হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ছাহেব আনওয়ারী রহ. নিজ শাইখের বাছাইকৃত কয়েকটি মালফূয করাচীর মাসিক বায়্যিনাত পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধে সংকলন করেছিলেন।

ইদারাতুল মাআরিফ, সংকলক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ছাহেব আনওয়ারী রহ. এর ছেলে মাওলানা মুহাম্মাদ আয়্যূবুর রহমান ছাহেব আনওয়ারী রহ. এর নির্দেশ পালনার্থে এই মালফূযাতকে সাধারণ মানুষের ফায়েদার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করার সৌভাগ্য হাসিল করছে।

আল্লাহ তাআলা কবূল করুন এবং সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে এই সংকলন থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হওয়ার তাউফীক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ মুশতাক সাত্তী
আফাল্লাহু আনহু

অনুবাদকের আরয

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

১৪১৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৮ ঈসায়ী সাল। আমি তখন মাদারে ইলমী, আযহারে হিন্দ দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীসের ছাত্র। কুরবানীর ছুটি উপলক্ষে মাদরাসা বন্ধ। বন্ধটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তাই নিয়ে চলল নানা জল্পনা কল্পনা। অবশেষে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হল যে, আমরা কয়েকজন বন্ধু দেওবন্দের আশেপাশে আকাবিরীনের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো যিয়ারত করব।

সত্যিই সেটা ছিল আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় সফর। আজ প্রায় বিশ বছর পর যখন ঐ সফরের স্মৃতি রোমন্থন করছি অন্তরে অন্য রকম ভাললাগার এক অনুভূতি হচ্ছে।

যাই হোক, ঐ সফরে আমরা সাহারানপুর, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ. এর শাইখ মিঞাজী নূর মুহাম্মাদ ঝিনঝানভী রহ. এর মাযার, হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর মাকবারাহ মাদরাসা ও খানকা, হাফেয যামেন শহীদ রহ. এর কবর, ঐতিহাসিক শামেলী ময়দান, ফকীহুন নফস কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর মাদরাসা ও মাকবারাহ, তাঁরই ঊর্ধ্বতন পুরুষ বিখ্যাত বুযুর্গ শাইখ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ. এর কবর, পাঞ্জাবের সারহিন্দে অবস্থিত হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর মাকবারাহ, এই পাঞ্জাবেরই ব্রাঁস এলাকায় মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর কাশফ অনুযায়ী ৩ জন নবী ও ৬ জন সাহাবীর কবর রয়েছে। আমরা সেখানেও যাওয়ার এবং রাত যাপনের সৌভাগ্য অর্জন করি। এ ছাড়া ঐতিহাসিক পানিপথও সফর করি। তবে এর মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ হল মুবাল্লিগে ইসলাম হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী (রহ.), তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা কান্ধলভী রহ. এবং শাইখুত তাফসীর হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী রহ. এর "কান্ধলা" শহরের সফর।

এখানেই সাক্ষাত হয় হযরত মাওলানা ইফতিখারুল হাসান কান্ধলভী (দাঃ বাঃ)-এর সাথে। শাইখুল হাদীস যাকারিয়্যা রহ. এর নিকটাত্মীয় প্রবীণ

এ বুযুর্গ আমাদের খুব সমাদর করেন। বিদায় নেওয়ার সময় প্রত্যেককে হাদিয়া দেন "মালফূযাতে হযরত রায়পুরী" রহ. এর তাজা ছেপে আসা ১টি করে কপি।

সেই কিতাবটির তরজমাই এখন প্রায় দুই দশক পর পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি। দেওবন্দে অধ্যয়নরত আমার কয়েকজন ছাত্রের নিকট থেকে জানতে পেরেছি যে, মাওলানা ইফতিখারুল হাসান ছাহেব (মুঃ আঃ) এখন খুব অসুস্থ, শয্যাশায়ী। আল্লাহ পাক তাঁকে সিহহত ও আফিয়াতের সাথে হায়াতে তায়্যিবাহ তাবীলাহ নসীব করেন। আমীন।

এই মালফূযাত সংকলন করেন হযরত রায়পুরী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা, ইসলামী ইতিহাসের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব, ইবনে হাজারে হিন্দ, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর খাস শাগরিদ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ছাহেব আনওয়ারী লায়েলপুরী (রহ.)। আল্লাহ পাক তাঁর কবরকে কিয়ামত পর্যন্ত শীতল রাখুন।

অনুবাদ জনিত কোনো বিচ্যুতি কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে জানালে খুশী হব। এই অনুরোধ রেখেই শেষ করছি অনুবাদকের আরয।

তারিখ
৩০ শাবান ১৪৩৮ হিজরী
২৭ মে ২০১৭ ঈসায়ী
সকাল ৬ : ২০ মিঃ

বিনীত
মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী (১৮৭৩ – ১৯৬২ ইং)

জন্ম : ১৮৭৩ খৃস্টাব্দ মোতাবিক ১২৯০ হিজরীর কিছু পরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

বংশ পরিচিতি : হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. এর বংশধর প্রথমত: পশ্চিম পাঞ্জাবের ক্যাম্বেলপুর জেলার তহুহা মুহাররাম খাঁ তহসিল তলাগঙ্গে বসবাস করতেন।

তিনি জন্মগতভাবে রাজপুত ছিলেন। তাঁর গোত্রের নাম ছিল জাটজীপ। এ বংশ উক্ত অঞ্চলে খুব পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিল।

তিনি স্বয়ং কখনো কখনো উল্লেখ করতেন যে, তিনি হিন্দুস্তানী বংশোদ্ভূত এবং তাঁর পূর্ববর্তী বংশধরগণ দ্বীনের বিশিষ্ট বুযুর্গগণের তাবলীগী মেহনত ও প্রচেষ্টায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

পিতৃ পরিচয় : হযরতের সম্মানিত পিতার নাম হাফেয আহমাদ (ইবনে মাওলানা মুহাম্মাদ আকরাম) তিনি কুরআনে মাজীদের তুখোড় হাফেয ছিলেন। পবিত্র কুরআন মুখস্ত ও তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ ও আকর্ষণ ছিল। তিনি সবসময় পবিত্র কুরআন পাঠে মনোনিবেশ করতেন এবং তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকতেন। স্বীয় জায়গা-জমি ও ক্ষেত-খামারে যাওয়ার পূর্বে পাঁচ পারা তিলাওয়াত করে নিতেন।

তিনি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তারতীলের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন। ক্ষেতের চতুর্দিকে ছাত্ররা উপস্থিত থাকত। যেখানেই একটু অবসর পেতেন, সেখানেই শিক্ষার্থীদের পূর্বপাঠ শুনতেন। যতই দুর্বল ও কম মেধাবী ছাত্র হোক না কেন, তাদের পিছনে পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রম দিতেন।

তিনি অসংখ্য হাফেযে কুরআন তৈরী করেছেন। সুবহে সাদিকের সাথে সাথে ফজরের নামায শুরু করতেন। নামাযের মধ্যে ক্বিরাআত এতই লম্বা ও দীর্ঘ করতেন যে, আযানের পর লোকেরা ঘুম থেকে জাগ্রত হত এবং পাক-পবিত্র হয়ে নামাযের জামাআতে শরীক হত।

কুরআনে কারীম হিফয পরবর্তী সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, আয়ত্বকরণ ও স্মরণে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেন। এজন্য বড় বড় হাফেযে কুরআন ব্যক্তিরাও তাঁর ভুল ধরতে গিয়ে নিজেরাই ভুলের শিকার হতেন।

মুহতারামা আম্মা : হযরতের আম্মাও অত্যন্ত বুযুর্গ নারী ছিলেন। তিনি অধিক পরিমাণে যিকির ও অযীফা আদায় করতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ইসমে যাতের যিকির ১২ হাজার বার পাঠ করতেন।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলতেন : আমি আমার আম্মাকে বলতাম: আম্মা! আপনি এত বন্দেগী করেন কেন? এত নীরব ও ঝামেলামুক্ত পরিবেশে থাকেন কেন? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন: বেটা! এ আর কতটুকু?

১৯৩০-৩১ ঈসায়ী ১৩৪৮-৪৯ হিজরীতে এ রত্নগর্ভা রমণী ইন্তিকাল করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন : হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. স্বীয় চাচা হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াসীন ও মাওলানা কালীমুল্লাহর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। উভয় চাচা খেয়ুড় নামক মহল্লায় বসবাস করতেন। উক্ত মাওলানা কালীমুল্লাহ রহ. এর নিকট তিনি কুরআন মাজীদ হিফয (মুখস্থ) করেন। তখন ঢেডিয়ার নিকটবর্তী ভরত শরীফ ও ঝাউরিয়া নামক স্থানে দুটি প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। উভয় মাদরাসায় তিনি মাওলানা খলীলুল্লাহ রহ. এর নিকট জ্ঞান অর্জন করেন।

মাওলানা খলীলুল্লাহ রহ. অত্যন্ত মুখলিস ও ছাহেবে নিসবত বুযুর্গ ছিলেন। তিনি একমাত্র আল্লাহ পাককে রাযী-খুশী করার জন্য বিনা বেতনে শিক্ষকতা করতেন।

পবিত্র হারামাইন শরীফাইনের সফরে মক্কা-মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করেন।

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে দিল্লী ভ্রমণ: হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. ১৮৯৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯০২ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ইলমে দ্বীন হাসিলের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে গমন করেন।

দিল্লীতে অধ্যয়নকালে তিনি মাদরাসার পক্ষ থেকে সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতেন না। তিনি অভ্যাস অনুযায়ী মসজিদের এক কিনারে লুকিয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তখন কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করে অনেক পীড়াপীড়ি করে বাধ্যতামূলকভাবে হযরতকে কিছু খাওয়াতেন।

স্বীয় শাইখ ও মুরশিদ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব রহ.-এর সান্নিধ্যে

কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর অন্যতম প্রধান খলীফা হলেন হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ.। হযরত

মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. আফযালগড় থেকে মাওলানা আব্দুর রহীমের রহ. নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখ করেন যে, আমি বাইআত হওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার নিকট আগমন করতে ইচ্ছুক। প্রতি উত্তরে তিনি লিখেন: "হাদীস শরীফে এসেছে اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ অর্থাৎ "যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হবে তাকে আমানতদার হতে হবে।" আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, আমি তেমন কিছু নই। তোমার মধ্যে তো যথেষ্ট তলব আছে। আমার মধ্যে তাও নেই। তুমি বরং আমার শাইখ মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর নিকট চলে যাও।"

আমার শাইখের এ পত্র পাঠে আমি হতবাক হয়ে পড়ি যে, ইখলাস ও আত্মবিলোপ কাকে বলে? কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নেই আমাকে অবশ্যই হযরত শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. এর আস্তিন ধরতে হবে এবং তাঁরই সান্নিধ্যে থাকতে হবে।

ফলশ্রুতিতে আমি পুনরায় শাইখের নিকট পত্র লিখি। সেখানে উল্লেখ করি যে, "আমার জানা আছে আপনি যা কিছু পেয়েছেন তা কেবল হযরত গাঙ্গুহী রহ. থেকেই পেয়েছেন। কিন্তু আমার অন্তরের প্রবল ইচ্ছা ও আকাংখা হল আমি আপনার নিকটেই বাইআত হব। আমার থাকা-খাওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার নিজের"।

আমার শাইখ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. এ পত্র পাঠ করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এবং উপস্থিত মুরীদ ও ভক্তদেরকে পত্রটি দেখান। অত:পর তিনি বলেন: "দেখো, একেই বলে 'তালিব,বা সত্যসন্ধানী'।

আলহামদুলিল্লাহ আমি ১৩২৩ হিজরী থেকে ১৩৩৭ হিজরী পর্যন্ত আমার শাইখের ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একটানা ১৪ বছর সফরে-হযরে তথা আবাসে-প্রবাসে তাঁর সান্নিধ্যেই কাটিয়ে দেই।

রায়পুর খানকায় অবস্থানকালে হযরতের সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার

রায়পুর খানকায় অবস্থান কালে হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. যে কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার দৃষ্টান্ত কেবল প্রাচীনতম পীর মাশায়িখের জীবন ও ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

হযরত রহ. বলতেন: আমি রায়পুর পৌঁছার পর সারাদিন বাগানের মধ্যে বিচরণ করতাম এবং কোন্ গাছের পাতা ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করব তা নিয়ে ভাবতাম। হযরত বলতেন: টানা দশটি বছর এভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, আমরা যারা মুরীদ ও হযরত রায়পুরী রহ. এর খানকায় অবস্থান করতাম, তাদের কপালে সারাদিনে কোন স্থান থেকে একটি মাত্র রুটি জুটেছিল। তাও আবার স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে কাঁচা ছিল।

হযরত আরো বলতেন: শুষ্ক রুটি খাওয়ার কারণে আমার পেটের মধ্যে ব্যথা অনুভূত হতে থাকে। মাঝে মাঝে গড় গড় শব্দ হত।

হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. এর রাজনৈতিক অভিমত ও মতাদর্শ

হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. স্বীয় মুরশিদ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. এর পদাংক অনুসরণ করতেন। হযরত আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. স্বীয় রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, সংগ্রামী প্রেরণা ও ইংরেজদের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে হযরত শাইখুল হিন্দের পক্ষে ছিলেন। তাই তিনি স্বীয় সুযোগ্য উত্তরসূরী হযরত আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. কে নসীহত করে বলেন: "তুমি শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর পক্ষ সমর্থন করবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করবে।"

হযরতের গুরুত্বপূর্ণ সফরসমূহ

দ্বীনী, দাওয়াতী ও ইসলাহী কাজে হযরত রায়পুরী রহ. দেশ-বিদেশের বহু অঞ্চল সফর করেন। এসব সফরের দ্বারা লক্ষ লক্ষ বনী আদম উপকৃত হন। দুনিয়ামুখী মানুষগুলো হয় আখেরাতমুখী। বাজারমুখী মানুষ হয় মসজিদমুখী। হযরতের এইসব সফরের মধ্যে ভারতের উত্তর প্রদেশ, উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ, ভারতের রাজধানী দিল্লী, বেরেলী, রামপুর, সাহারানপুর ও মুরাদাবাদ এর সফরগুলো উল্লেখযোগ্য।

আর দেশের বাইরেও তিনি অনেক সফর করেন। এর মধ্যে হারামাইন শরীফাইনে একাধিকবার সফর করেন। হযরতের সর্বশেষ হজ্জের সফর ছিল শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা কান্ধলভী রহ. এর মেয়ের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জের উদ্দেশ্যে ১৩৬৯ হিজরী মোতাবিক ১৯৫০ খৃস্টাব্দে।

এ ছাড়া ১৯৪৭ ঈসায়ীতে দেশ ভাগের পর তিনি বহুবার পাকিস্তান সফর করেন। বিশেষত পবিত্র রামাযান মাস তিনি পাকিস্তানেই বেশি কাটাতেন। এ সময় দূর-দূরান্ত থেকে শত-সহস্র মানুষ পঙ্গপাল এর মত ছুটে আসত।

দেশ বিভক্তির পর হযরতের সর্বপ্রথম পাকিস্তান সফর হয় ১৩৬৮ হিজরী মোতাবিক ১৯৪৯ খৃস্টাব্দে। আর পাকিস্তানে সর্বশেষ সফর হয় ১৩৮২ হিজরী মোতাবিক ১৯৬২ খৃস্টাব্দে।

হযরতের পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ সফর

হযরত রায়পুরী রহ. পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশেও একবার সফর করেছিলেন। ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে সায়্যিদ মুহাম্মাদ জামীল সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের একাউন্টেট জেনারেল ছিলেন। জামীল সাহেব হযরত ওয়ালা রায়পুরী রহ. কে আন্তরিকভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তিনিই হযরতকে পূর্ব পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। হযরতও তাঁর সে দাওয়াত কবূল করেন।

১৯৫৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হযরত সফর আরম্ভ করেন। প্রথমে দিল্লী থেকে কলিকাতা আগমন করেন। সেখানে ২/৩ দিন অবস্থান করে উড়োজাহাজে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। মাগরিব নামাযের নিকটবর্তী সময়ে জাহাজ ঢাকা পৌঁছায়। জাহাজ থেকে অবতরণ করে জামাআত এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করেন। অত:পর সরাসরি সায়্যিদ জামীল সাহেবের বাসভবনে চলে যান।

ঢাকাতে খান বাহাদুর হাজী শেখ রশীদ আহমাদ সাহেবের বড় ছেলে হাজী মতীন আহমাদ সাহেব বসবাস করতেন। হযরত ঢাকা সফরে এসে তাঁকে বাইআত করেন। তিনি চট্টগ্রামে বেড়াতে যাওয়ার জন্য হযরতকে আমন্ত্রণ জানান।

হযরতের চট্টগ্রাম সফর

হাজী মতীন সাহেবের দাওয়াত হযরত কবূল করেন। ফলে একটি ছোট প্রতিনিধি দল নিয়ে হযরত চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন।

হযরতের চট্টগ্রাম আগমনের সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে লোক ভীড় জমাতে থাকে। চট্টগ্রামে মোট তিন দিন অবস্থান করেন।

ঐতিহ্যবাহী হাটহাজারী মাদরাসার মুহতামিম বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব ছাহেবের রহ. দাওয়াতে হযরত মাদরাসায় উপস্থিত হন। এ ভ্রমণ কার যোগে হয়েছিল। মাদরাসায় ২ ঘন্টা অবস্থান করেন।

অত:পর ঐতিহাসিক পটিয়া মাদরাসায় মুফতী আযীযুল হক ছাহেব রহ. এর দাওয়াতে রেল যোগে সেখানে উপস্থিত হন। প্রায় ৩ ঘন্টা সেখানে অবস্থান করেন।

উভয় মাদরাসায় ছাত্র সংখ্যা এবং শিক্ষা ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে হযরত রহ. অত্যন্ত আনন্দিত হন। পূর্ব বাংলায় হযরত মোট ১৫ দিন অবস্থান

করেন। এখান থেকে বিমান যোগে পাকিস্তান এবং লাহোরে প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে হযরতের উপস্থিতিতে মানুষের ভীড় লেগেই থাকত।

হযরত শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. এর বিনয় ও নম্রতা

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা কান্ধলভী রহ. তাঁর আত্মজীবনী "আপবীতি"তে (২: ২৬৬) বলেন: আমি এই ঘটনাও লিখিয়েছি যে, হযরত আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. একবার থানাভবন যান। হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: " আমি তো রায়পুরে হযরত আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. এর খেদমতে হাযির হয়েছিলাম। আপনার কথা তো মনে পড়ছে না।" প্রতি উত্তরে হযরত আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. বলেন: হযরত! আমাকে আপনার কী করে মনে থাকবে? সেখানে তো আমার কোন অবস্থান ও মর্যাদাই ছিল না। এতটুকু হয়ত মনে থাকতে পারে যে, হযরত আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. এর কাছে পাতলা জামা ও লুঙ্গী পরিহিত একজন খাদেম বারবার আসা-যাওয়া করত। হযরত থানভী রহ. বলেন, " হাল্কা মনে পড়ছে।" হযরত রায়পুরী রহ. বলেন: "সেই হলাম আমি।"

একবার এক ব্যক্তি থানাভবন থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে আসে এবং হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এর সামনে বেআদবীর সাথে থানাভবনের কথা উঠায়। হযরত রায়পুরী রহ. বলেন: "হযরত থানভী আমারও শাইখ।" এ কথা শুনে লোকটি চুপ হয়ে যায়।

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর প্রতি হযরত রায়পুরী রহ. এর ছিল অসাধারণ ভক্তি ও ভালবাসা। যে মজলিসে হযরত মাদানীর কোন সমালোচক বা বিরোধী লোক থাকত, সেখানে হযরত আরো বেশি আবেগদীপ্ত ভঙ্গিমায় হযরত মাদানী রহ. এর গুণাবলীর আলোচনা করতেন।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী রহ. এর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। 'হযরত দেহলভী' ছাড়া অন্য কোন নামে কখনো তাঁকে উল্লেখ করতেন না। নিজের খাদেমদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে হযরত দেহলভী রহ. এর খেদমতে পাঠাতেন এবং নিজেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিযামুদ্দীন মারকাযে যেতেন। কয়েকদিন সেখানে অবস্থানও করতেন।

জীবনাবসান

১৩৮২ হিজরীর **১৪ই** রবীউল আউয়াল মোতাবিক **১৯৬২** খৃস্টাব্দের **১৬ই** আগস্ট বৃহস্পতিবার মহান আল্লাহর এই ওলী পাকিস্তানের লাহোরে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৯০ (নব্বই) বছর।

আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত হযরতের কবরে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আমীন।

দৈহিক গঠন

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা আনোয়ারী ছাহেব রহ. হযরতের শারীরিক গঠন বর্ণনা করে লিখেন: "হযরতের দেহের উচ্চতা মধ্যম মানের ছিল। চেহারা উজ্জল ছিল। কপালের উপর তারার মত চমকাতো। দাঁত মুক্তার মত সাদা দেখাত। যখন হাসতেন তখন দারুণ সুন্দর দেখাতো। তিনি অধিকাংশ সময় খামুশ থাকতেন।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে অধিকাংশ সময় চোখ বন্ধ রাখতেন। মনে হত যেন নীরবে পাঠ দান করছেন। চোখ বড় কিন্তু সুন্দর ছিল। যে তাঁকে দেখতো, তার অন্তর দুরু দুরু করত। তথাপি তাঁকে খুব ভালবাসত"।

তথ্যসূত্র

১। সাওয়ানিহে শাইখ আব্দুল কাদের রায়পুরী বা শাইখ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. এর জীবনী।

মূলঃ মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.

অনুবাদঃ মাওলানা শাহ আব্দুল হালীম হুসাইনী (মাকতাবাতুল আযহার)

২। 'আপবীতি' বা শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা কান্ধলভী রহ. এর আত্মজীবনী।

অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ অছিউর রহমান (থানভী লাইব্রেরী)

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক আলেম মাওলানা আব্দুর রশীদ নোমানী ছাহেব রহ.-এর

ভূমিকা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

نَحۡمَدُهٗ وَ نُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ

আমাদের শাইখ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের ছাহেব রায়পুরী রহ. এ যুগের অনেক বড় মুসলিহ বা সংশোধনকারী, অনেক বড় আরেফ এবং অনেক বড় ওলী ছিলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে মাকবূলিয়্যত বা গ্রহণযোগ্যতাও এমন দান করেছিলেন যে, বিশাল জনগোষ্ঠী তাঁর বরকতময় সান্নিধ্য থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং আভ্যন্তরীণ দীক্ষা অর্জন করেছেন। আর যাঁরা তাঁর মুবারক হাতে তাওবা করেছেন, তাঁদের সংখ্যা নির্ধারণ করাও মুশকিল। কোন অতিরঞ্জন ছাড়াই বলা যায় যে, তাঁর সাথে সম্পৃক্ত মানুষের সংখ্যা লাখের কোটা ছাড়িয়ে যাবে।

এই কিতাবে হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এর একজন (বিশিষ্ট) খলীফা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ছাহেব আনওয়ারী লায়েলপুরী কর্তৃক সংকলিত মালফূযাত আপনারা মুতালা'আ (অধ্যয়ন) করবেন।

এই মাওলানা ছাহেবের আমাদের হযরত রায়পুরী রহ. এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আর হযরতের মজলিসগুলোতে ইলমী মাসায়িলের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় তাঁর দিকেই রুজু করা হত।

মাওলানা লায়েলপুরী রহ. আমি অধমের নামে একটি লেখায় বলেন : এটা হযরত রায়পুরী রহ. এর স্নেহ যে, অধমকে রায়কোট থেকে ডেকে বাইআত করে নিয়েছেন। আর অল্প কিছুদিন পর ইজাযতও দিয়ে দিয়েছেন। আর বারবার পীড়াপীড়ি করে বলছিলেন, তুমি বাইআত করে নাও।

আমি বললাম : হযরত! শরম লাগে। হযরত বললেন : "আমি লোকদেরকে লিখে দিব যে, আমার তাওয়াজ্জুহ বা বিশেষ দৃষ্টি আপনার দিকে নিবদ্ধ।"

অতঃপর প্রত্যেক সফরে এটাই বলতেন। যখন দেশ পরিবর্তন হয়ে গেল, তখন তো বহুবার বলেছেন এবং চিঠিপত্রসমূহও পাঠাতে থাকতেন।

মাওলানা এটাও লিখেন যে, একবার আমি অধম রায়পুরে উপস্থিত ছিলাম। হযরত আকদাস নির্জনে অবস্থান করছিলেন। মাগরিবের পর আমাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, যিকিরের সময় কিছু নূরও অনুভব করেন কি? আমি আরয করলাম যে, সীনার মধ্যে আলো অনুভূত হয়, আর তবিয়তে প্রশান্তি ও অন্তরে স্থিরতাও আছে। আর যিকিরের পরে এমন মনে হয় যে, দিলের উপর থেকে বোঝা হালকা হয়ে গেছে। আর যিকিরের সাথে দিলের এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, পুরা করা ছাড়া মনে প্রশান্তি আসে না। আর অধিকাংশ রাতে স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারত নসীব হয়।

হযরত খুবই আনন্দিত হলেন। বললেন : আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আপনার অনুভূতিও আছে। আর এই সব হল যিকিরের প্রতিক্রিয়া। এটাকে “তাজাল্লী” বলা হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পারাটা অনেক বড় বরকতময় ব্যাপার। ইনশাআল্লাহ আপনার নিসবতে মুহাম্মাদিয়া হাসিল হবে। আমি সুসংবাদ দিচ্ছি।

এ দুটি লেখার মাধ্যমে হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এর সঙ্গে হযরত মাওলানা লায়েলপুরী রহ. এর যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক, বিশেষ স্নেহ ও মনোযোগ ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি মাওলানা লায়েলপুরীর রহ. খেদমতে গুযারিশ করেছিলাম যে, যদি হযরত আকদাস রহ. এর মালফূযাত, মাকতূবাত, এবং জীবনী বিষয়ক কিছু কথা হযরতওয়ালা লিখে দেন, তাহলে খুব ভাল হবে। মাওলানা দয়া করে আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন। যার উপর আমরা মাওলানার শোকর আদায় করছি।

–আব্দুর রশীদ নোমানী

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

মালফূযাতে রায়পুরী রহ.

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. একটি স্বপ্ন ও তার তা'বীর	১৯
২. স্কুলের চাকুরী থেকে অব্যাহতি	১৯
৩. সুনাম ও দুর্নাম যদি বরাবর হয়ে যায় তাহলেই কাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ	২০
৪. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর ইলমী গভীরতা	২০
৫. হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. সূফীও ছিলেন	২১
৬. হযরত রায়পুরী রহ. এর যিকির	২১
৭. শাইখে কামেলের সাহচর্য ব্যতীত তাসাওউফ হাসিল হয় না	২২
৮. আল্লাহ আল্লাহ যিকির করা জায়েয আছে, এটা বিদআত নয়	২৩
৯. হযরত রায়পুরী রহ.-এর বিনয়	২৪
১০. যিকির যত বেশি হবে তাওয়াক্কুল তত বদ্ধমূল হবে	২৪
১১. জনৈক নবাব সাহেব এবং হযরত রায়পুরী (রহ.)	২৫
১২. একমাত্র আল্লাহ পাকের উপরই ভরসা করতে হবে	২৬
১৩. বাইআত হওয়ার আসল উদ্দেশ্য হল সৎসঙ্গ অর্জন করা	৩০
১৪. মাওলানা রূমী রহ. এর ব্যাপারে হযরত ফরীদুদ্দীন আত্তার রহ. এর ভবিষ্যদ্বাণী	৩২
১৫. আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের সাহচর্য অত্যন্ত ক্রিয়াশীল জিনিস	৩৩
১৬. হযরতওয়ালা আবদুর রহীম রায়পুরীর রহ. সাহচর্যের প্রভাব	৩৫
১৭. জনৈক হিন্দু রাজার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী	৩৫
১৮. আসল মাকসূদ হল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা	৩৭
১৯. সাহাবায়ে কেরামের রাযি. মর্যাদা	৩৮
২০. আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মেহমানদারী	৩৮
২১. হযরত শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ. এর একটি ঘটনা	৩৯
২২. তাওয়াক্কুল শাহ রহ. এর ঘটনা	৪০
২৩. তাওয়াক্কুলের সুফল	৪১
২৪. ওয়ায-নসীহতে প্রতিক্রিয়া হয় না কেন?	৪১
২৫. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর কবিতার প্রতিক্রিয়া	৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৬. জনৈক বুযুর্গের ঘটনা	৪২
২৭. শাইখের কথামত চলা জরুরী	৪২
২৮. হযরত শাহ আবুল মাআলী রহ. এবং তাঁর শিষ্য হযরত মীরান ভেক রহ. এর ঘটনা	৪৩
২৯. সাপের দংশন, পাগলা কুকুরের কামড় ও বিষাক্ত প্রাণীর বিষের তাদবীর	৪৪
৩০. পেরেশানী থেকে মুক্তির তাদবীর	৪৫
৩১. যে ইলম আল্লাহর দিকে পথ দেখায় না সেটা মূর্খতা	৪৫
৩২. নিসবতের মর্ম কি ?	৪৭
৩৩. হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ.-এর জ্ঞানের গভীরতা	৪৭
৩৪. হাদীস বিশারদ শ্রেফ সৌদীতেই সীমাবদ্ধ নয় এর বাইরেও অনেক হাদীস বিশারদ আছেন	৪৮
৩৫. পানির মধ্যে শ্বাস নেয়া নিষেধ দম করা নিষেধ নয়	৪৯
৩৬. যিকির যখন শরীরের অংশ হয়ে যায় তখন অনুভূত হয় না	৫০
৩৭. যে জান্নাত চায় সে আসলে আল্লাহকেই চায়	৫০
৩৮. শাখা প্রশাখাগত মাসআলায় যথাসম্ভব বিতর্ক এড়িয়ে চলাই নিরাপদ পথ	৫১
৩৯. ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তে হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর অবস্থা	৫৩
৪০. এমনভাবে যিকির করতে হবে যে, আমার সারা শরীর আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকে	৫৪
৪১. নিজেকে সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট মনে করাই হল তাসাওউফের উদ্দেশ্য	৫৫
৪২. আল্লাহর পথের পথিকের বিশেষ অবস্থা	৫৫
৪৩. শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী রহ. এর বিস্ময়কর কাহিনী	৫৫
৪৪. প্রসঙ্গ : যিকিরের সময় কুরআনে কারীমের আওয়ায আসা	৫৬
৪৫. সংকলক এবং রায়পুরী রহ. এর মধ্যকার একটি ঘটনা	৫৭
৪৬. বুযুর্গানে দ্বীনের সান্নিধ্যের বরকত	৫৭
৪৭. হযরতের কাব্যচর্চা	৫৮
৪৮. কালিমায়ে তায়্যিবার প্রভাব	৫৮
৪৯. ‘জায্‌ব’ বা আকর্ষণ কাকে বলে?	৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫০. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. ও মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরীর রহ. মধ্যে পরস্পর মহব্বত	৫৯
৫১. হযরত রায়পুরী রহ. এর দয়া ও মায়া	৫৯
৫২. হযরত রায়পুরী রহ. এর দয়া মায়ার একটি ঘটনা	৬০
৫৩. হযরতের সাথে রেলগাড়ীর সফরে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা	৬০
৫৪. বুযুর্গানে দ্বীন সব সময় ছোটদের প্রতি খেয়াল রেখে থাকেন	৬০
৫৫. হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এর সাথে মাসূরী পাহাড়ে ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত	৬১
৫৬. হাদীসের শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখাও জরুরী	৬২
৫৭. ইসলামী বিবাহ হবে সবধরনের রসম বা কুপ্রথামুক্ত	৬৪
৫৮. বুযুর্গানে দ্বীনের ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করা অনুচিত	৬৫
৫৯. কেউ যিকিরে রত থাকলে আশপাশের মানুষের কথাবার্তা বলা অনুচিত	৬৫
৬০. পূর্বে আল্লাহর ভয়ের প্রাবল্য ছিল, এখন আল্লাহর ভয়ের মধ্যে কমতি এসে গেছে	৬৬
৬১. নিজ কাজে ব্যস্ত থাকবে, শাইখের কারামত তালাশে সময় নষ্ট করবে না	৬৬
৬২. ইলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন	৬৬
৬৩. শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারিফাত এর মর্ম	৬৭
৬৪. একটি চমৎকার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা	৬৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

মালফূযাতে রায়পুরী রহ.

১. একটি স্বপ্ন ও তার তা'বীর

রায়পুরেরই ঘটনা। আমি আরয করলাম যে, হযরত! স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার নসীব হয়েছে। আমরা কয়েকজন সাথী। আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বুখারী শরীফ সাত পারা পড়েছি। হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন, "অত্যন্ত মুবারক স্বপ্ন। আপনি এক সময় বুখারী শরীফ পড়াবেন বরং হাদীসের সমস্ত কিতাবের দরস দিবেন।"

পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা বছরের পর বছর এ দৌলত নসীব করেছেন। এ বছর তো লাগাতার রোগ ব্যাধির কারণে দরস দানের সুযোগ হয়নি, নতুবা প্রত্যেক বছর পুরো ছয় কিতাব (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবু দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ) এবং মুয়াত্তা ইমাম মালেক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, শরহে মাআনিল আছার ইমাম তহাবী পড়িয়েছি।

২. স্কুলের চাকুরী থেকে অব্যাহতি

১৯৪৪ ঈসায়ী সালে লুধিয়ানায় হযরত আকদাস রায়পুরী রহ. আগমন করেছিলেন। রাত দুটো বেজে আমি অধমকে ডাকলেন এবং বললেন যে, "আমি আপনার উপর খুব খুশী। আপনি যিয়াউল কুলূব মুতালা'আ করুন। সেটারও অনুমতি দিচ্ছি। সে অনুযায়ী বাইআত করে নিবেন। আর স্কুলের চাকুরী থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিবেন। (অধম স্কুলে চাকুরী করত) ব্যস তাওয়াক্কুল করে বসে পড়বেন। ইনশাআল্লাহ টাকার মধ্যে খেলবেন, কারো

মুখাপেক্ষী হবেন না। রাত্রের ঘটনা তো আমাকে বিশ্বাস করিয়েছে যে, আপনি মাশাআল্লাহ সবকিছু বরদাশত করতে পারবেন।"

অধম পরদিন অব্যাহতি পত্র দিয়ে দেই। এমন মনে হচ্ছিল যে, এখন মানুষের মধ্যে শামিল হয়েছি।

পরে তো আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে সর্বদিক দিয়ে সাচ্ছন্দ্যময় করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আল হামদুলিল্লাহ।

৩. সুনাম ও দুর্নাম যদি বরাবর হয়ে যায় তাহলেই কাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : যখন যিকিরকারীর নিকট প্রশংসা এ বদনাম বরাবর হয়ে যায়, তখনই ইনশাআল্লাহ কাজ বনে যাবে। নিজেকে এত নীচে নামিয়ে দিবে যে, আমি তো কিছুই নই। এই বিশ্বাস যেন সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আমিই সবচেয় বেশি নিকৃষ্ট, সবাই আমার থেকে ভাল।

আমি আরয করলাম যে, ভাওয়ালপুরে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেছিলেন : আমাদের আমলনামা তো কালো আছেই। এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, গলির কুকুরও আমাদের থেকেও ভাল। হতে পারে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহব্বতে (খতমে নবুওয়াত সম্মেলনে) ভাওয়ালপুর আসাটা আমাদের মাগফিরাতের উপলক্ষ হয়ে যাবে। এ কথা শুনে পুরো মজমা চিৎকার দিয়ে উঠে।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এ ঘটনা শুনে দারুন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন : "বাস্তবেই শাহ ছাহেব রহ. اٰيَةٌ مِّنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ বা আল্লাহর নির্দশনসমূহের মধ্যে এক নিদর্শন ছিলেন।"

৪. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর ইলমী গভীরতা

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : আমি মোল্লা হাসান ও তিরমিযী শরীফের কিছু অংশ হযরত শাহ ছাহেব রহ. এর নিকট পড়েছি। সবক পড়ানোর সময় কোথা থেকে কোথায় চলে যেতেন। আমি তো গাইরে মুকাল্লিদই হয়ে যেতাম যদি শাহ ছাহেব রহ. এর খেদমতে হাযির না হতাম। যখন হাযির হলাম তখন তিরমিযী শরীফে ইমাম ছাহেব এর পেছনে সূরা ফাতিহা পড়ার আলোচনা চলছিল। যখন হযরত শাহ ছাহেব রহ. এর বক্তব্য শুনলাম, তখন অন্তর শীতল হল যে, আমাদের নিকটও প্রমাণাদী আছে।

৫. হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. সূফীও ছিলেন

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : একবার দিল্লীর সুনহারী মসজিদে আমি দেখলাম যে, আল্লামা আনওয়ার শাহ ছাহেব রহ. ইসমে যাত আল্লাহ আল্লাহ যিকির মধ্যম পর্যায়ের উচ্চস্বরে করছেন। হুজরার ভেতরে বসা ছিলেন। আর দরওয়াজায় পর্দা ঝুলানো ছিল। ঐ সময় আমি বুঝলাম যে, শাহ ছাহেব সূফীও বটে। তিনি হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর খেদমতে যেতেন।

৬. হযরত রায়পুরী রহ. এর যিকির

১৯৪০ ঈসায়ী সালে অধম যখন রায়পুর উপস্থিত হল তখন হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন যে, হযরতওয়ালা আব্দুর রহীম রায়পুরী (রহ) এর খেদমতে আমি যখন উপস্থিত হয়েছি, তখন ভাই মুয়িযযুদ্দীন ছাহেব খাদেম ছিলেন। আমরাও হুজরার মধ্যে থাকতে লাগলাম। পুরানো গুড় রাখা ছিল। সেটাকে পরিষ্কার করে রেখেছিলেন। ব্যস চায়ের মধ্যে সেটাই ঢেলে পান করতেন। আর ভাঙ্গা একটি লাঠি ছিল। বিষাক্ত প্রাণীগুলোকে এর দ্বারা তাড়িয়ে দিতেন। বেড়ি টেড়ি কখনো দেখিওনি। আর না কখনো লালটিন নিয়ে যেতেন। ব্যস অন্ধকারের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা হেফাযত করতেন।

যিকিরের সাথে তাঁর মন মানসিকতা এমনভাবে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল যে, এক মজলিসেই পুরা করে নিতেন। অত্যন্ত জোশের সাথে যিকির করতেন। মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছাহেব (শাইখুল হাদীস যাকারিয়্যা রহ.-এর সম্মানিত আব্বাজান) রহ. সাহারানপুর থেকে আগমন করলে আমার নিকট এসে বসতেন। আর বলতেন যে, তোমার যিকির শুনতে এসেছি। সাড়ে তিন ঘণ্টায় যিকির পুরো হয়ে যেত। এরপর যখন কোমর ধরে যেত, তখন একটা তক্তার সাথে টেক দিয়ে দাঁড়াতাম। যিকির পূর্ণ করা ব্যতীত কোন কিছু আমার ভাল লাগত না। এখন তো মানুষের যিকির এর আগ্রহ কমে গেছে। অধিকাংশ সময় ফার্সী এ কবিতাটি পাঠ করতেন :

صوفی نہ شود صافی تا درنہ کشد جامے

بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے

অর্থাৎ সূফী পরিশুদ্ধ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত মহব্বতের পেয়ালা বহন না করে অর্থাৎ যিকির আযকার না করে। অনেক বেশি সফর করতে হবে যাতে

করে কাঁচা বস্তু পাকা হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহকে পেতে হলে অনেক মুজাহাদা করতে হবে।

৭. শাইখে কামেলের সাহচর্য ব্যতীত তাসাওউফ হাসিল হয় না

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার পথে গোস্বা হল একটি প্রতিবন্ধক। এর দ্বারা আধ্যাত্মিক লাইনে উন্নতি থেমে যায়। যথাসম্ভব কষ্ট সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, দারিদ্র ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত থাকবে। ইনশাআল্লাহ কিছু একটা হবে।

আমি (সংকলক) একবার আরয করলাম যে, হযরত! আমি এই দরবারে একটা বিষয় লক্ষ করেছি যা অন্য কোন দরবারে আমি দেখিনি। সেটা হল নিজেকে ছোট মনে করা, তুচ্ছ ভাবা, এমনকি খাদেমবৃন্দকেও নিজের চেয়েও ভাল মনে করা। হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন : হ্যাঁ, আপনি খুব সুন্দর বুঝেছেন। যতক্ষণ বিনয় থাকে, আল্লাহর পথে উন্নতি হতে থাকে। আর যখন মনে করে যে, আমিও কিছু একটা! তো ব্যস সেখানেই থেকে গেল।

লোকেরা আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের নিকট এ জন্যই যায় যাতে করে নফসের মন্দ স্বভাবগুলো দূর হয়ে যায়। এবং ভাল স্বভাবগুলো পয়দা হয়ে যায়।

শাইখ চিকিৎসক হয়ে থাকেন, তিনি সালেকের অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখেন। উদাহরণস্বরূপ : কৃপণতা একটি আত্মিক রোগ। সেটা দূর হয়ে যাক আর উদারতা বা দানশীলতা পয়দা হয়ে যাক। নিজেকে প্রদর্শনের পরিবর্তে নিজের দোষসমূহের উপর দৃষ্টি পড়ুক।

আর যিকিরের দ্বারা অন্তরে প্রশস্ততা আসে। নিজের দোষগুলোর দিকে দৃষ্টি যায়। নতুবা শুধু অন্যের দোষের দিকে নজর যায়। নিজের দোষ নজরে পড়ে না। খোদপসন্দীর পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করবে এবং আল্লাহর নেয়ামত মনে করবে যে, যদি আল্লাহ তাআলাই দয়া মায়া না করতেন তাহলে আমি কিছুই করতে পারতাম না।

হযরতওয়ালা রহ. বলতেন : লোকেরা “তাসাওউফ”কে জানি না কী মনে করে? “তাসাওউফ” তো বলা হয় উত্তম গুণাবলী অর্জিত হওয়াকে। যেটা শাইখে কামেলের সাহচর্য ব্যতীত হাসিল হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতা এটাই বলে।

৮. আল্লাহ আল্লাহ যিকির করা জায়েয আছে, এটা বিদআত নয়

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। আমি (সংকলক) হযরত আকদাসের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তো দেখি যে, হযরত মাওলানা মরহুম কারীম বখশ ছাহেব যিনি আরবী গভর্ণমেন্ট কলেজ লাহোরের প্রফেসর ছিলেন। হযরতের সাথে এ কথা বলে তর্ক করছিলেন যে, আপনি সুন্নাত পরিপন্থী যিকির করান। হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. আমার দিকে তাকালেন। তখন আমি আরয করলাম যে, সহীহ মুসলিমে হাদীস বিদ্যমান

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

অর্থাৎ "ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ বলার মত কেউ না থাকবে।" তাহলে কি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিদআতের সবক দিয়েছেন?

আর তিরমিযী শরীফেও হাদীস আছে। এবং আরফুয শাযীতে হযরত শাহ ছাহেব রহ. বলেন :

فَعُلِمَ مِنْهُ الْاِسْمُ الْمُفْرَدُ أَيْضًا ذِكْرٌ

অর্থাৎ "এ হাদীসে পাকের দ্বারা বুঝা গেল যে, শুধু আল্লাহ নামটাও যিকির।"

হযরত শাহ ছাহেব রহ. নিজেও এ ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন।

এতদ্ব্যতীত হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. "আল কাওলুল জামীল" গ্রন্থে কাদেরিয়্যাহ তরীকার যিকির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন : তাঁদের নিকট প্রথমে আট তাসবীহ। পাঁচটি হল আল্লাহ আল্লাহ ইসমে যাতের আর তিনটি হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নফী ইসবাতের যিকির। এটা কি তাহলে বিদআত?

উপরন্তু হযরত বিলালে হাবশী রাযি. আহাদ আহাদ এর নারা লাগাতেন (সুনানে ইবনে মাজা পৃ: ১৪) যখন দুরাচার উমাইয়া বিন খালফ হযরত বিলাল রাযি.-এর উপর অত্যাচার করত। তাহলে কি এটা বিদআত?

অতঃপর যখন হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. জালান্ধর গমন করেন আর আমাকে নির্দেশ দেন যে, মাদরাসা খাইরুল মাদারিসে গিয়ে কিতাব এনে আমাকে দেখাও। ফলে আমি গেলাম এবং হযরত মাওলানা খাইর মুহাম্মাদ ছাহেব রহ. এর নিকট আমি আরয করলাম যে, তাফসীরে আযীযীতে

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝

অর্থাৎ "আপনি আপনার প্রভুর নাম স্মরণ করুন এবং সব দিক হতে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র তাঁর দিকে মগ্ন হন"। (সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত : ৮)

এ আয়াতে কারীমার তাফসীর একটু দেখতে চাই।

ফার্সী ভাষায় রচিত অত্যন্ত সহীহ নুসখা বের হয়ে আসল। এতে হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ. অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে এ মাসআলাটি লিখেছেন। ঐ কিতাব এনে আমি মূল পাঠ হযরতকে শোনালাম।

এছাড়া "اليواقيت و الجواهر" গ্রন্থে হযরত শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব শারানী রহ. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ অর্থাৎ "আর আল্লাহর যিকিরই হল সর্বশ্রেষ্ঠ"।
(সূরা আনকাবূত : ৪৫) এর ব্যাখ্যায় লিখেন :

وَلَذِكْرُ اِسْمِ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِ سَائِرِ اَسْمَائِهِ

অর্থাৎ "আর আল্লাহ তাআলার নামের যিকির অবশ্যই শ্রেষ্ঠ অন্য সমস্ত নামের যিকিরের চেয়ে।" এটাও আমি হযরতকে শোনালাম। হযরতওয়ালা খুব খুশী হলেন। এবং সাহারানপুর পৌঁছে এ সমস্ত ঘটনা নিজে হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়্যা রহ.-কে শুনিয়েছেন। আমিও সাথে ছিলাম।

৯. হযরত রায়পুরী রহ.-এর বিনয়

একবার হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. লায়েলপুরে অধমের (সংকলক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ছাহেব আনওয়ারী লায়েলপুরী রহ.) বাসায় রাতের বেলা তাশরীফ এনেছিলেন। আমার একজন বন্ধু সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : এ বুযুর্গ কে? আমি আরয করলাম : "আমাদের পীর ছাহেব। আল্লাহ তাআলার পথ বাতলে দেন"। এটা শুনে হযরত আদকাস রহ. বলতে লাগলেন : "তাওবা তাওবা, আমি তো খাদেম।"

সুবহানাল্লাহ! এই ছিল হযরতওয়ালার রহ. বিনয় ও নিজেকে ছোট করা।

১০. যিকির যত বেশি হবে তাওয়াক্কুল তত বদ্ধমূল হবে

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. একবার বলেন : যখন যিকিরকারী খুব বেশি বেশি যিকির করে, তখন তাওয়াক্কুলের বিশেষ অবস্থা বদ্ধমূল হয়ে যায়। এবং তাওহীদের উপর ইয়াকীন হয়ে যায়। ঐ সময় মানুষ আমলী একত্ববাদী হয়ে যায়। প্রতিটা জিনিস আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ

অবস্থা বদ্ধমূল না হবে বুঝতে হবে সে এখনো কাঁচা। আর আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন এই মুরাকাবা বা ধ্যান খুব মযবূতীর সাথে হয়। কোন সময়ই মন গাফেল থাকে না। এবং حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ অর্থাৎ "মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনি আপনার প্রভুর ইবাদত করুন" (সূরা হিজর : ৯৯) যিন্দেগীতেই নসীব হয়ে যায়। তখন সে ঈমানে তাকলীদী বা অনুসরণযোগ্য ঈমান থেকে বের হয়ে যায় এবং মুশাহাদার [চাক্ষুষ দেখা] ঈমান নসীব হয়।

আর اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ অর্থাৎ "তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর কেমন যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ আর যদি তুমি আল্লাহকে দেখতে না পার, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন" এটাও কিন্তু দরজায়ে হুযূরী বা উপস্থিতির স্তরের পর মুশাহাদার দরজা। সর্বনিম্ন স্তর হল 'হুযূরী' فَاِنَّهٗ يَرَاكَ অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাকে দেখছেন" এটা হল 'হুযূরী'। যেমনিভাবে কোন একজন মুহাক্কিক আলেম লিখেছেন।

আমি আরয করলাম যে, "ইনজাহুল হাজাহ" গ্রন্থে হযরত শাহ আব্দুল গণী রহ. এভাবেই বয়ান করেছেন।

একথা শুনে হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. খুব খুশী হলেন।

১১. জনৈক নবাব সাহেব এবং হযরত রায়পুরী (রহ.)

সম্ভবত: ১৯৪০ ঈসায়ীর ঘটনা। হযরত দেরাদুন শহরে হাফেয ইবরাহীম ছাহেবের কুঠিতে রাসপানা নদীর কিনারে অবস্থান করছিলেন। রাজপুরে খেড়ীর একজন নবাব সাহেব দাওয়াত করেছেন যে, হযরত মেহমানবৃন্দসহ আমার দাওয়াত খাবেন, হযরত বললেন : আমরা তো এখানেই দাওয়াত খাব। তোমরা দাওয়াত তৈয়ার করে এখানে পৌঁছে দাও। নবাব সাহেব কবূল করে নিলেন। মোটর গাড়ীতে দাওয়াতের সামানা রেখে দেরাদুনেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। হযরত আকদাস রায়পুরী রহ. খুশীর সাথে দাওয়াত খেয়ে নিয়েছেন।

আমার অন্তরে এমনিতে ওয়াসওয়াসার মত আসল যে, দাওয়াত খাওয়ার জন্য আমরা গেলেই মনে হয় ভাল হত। হযরতওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে বললেন : "এরা অনেক উঁচু পর্যায়ের মানুষ। আমাদেরকে আবার কবে খাতির করে? এরা তো নিজেদের কুকুরকে মোটরে রেখে বসিয়ে চিকিৎসা করানোর জন্য দেরাদুনে পাঠিয়ে দেয়। আমাদের খানা যদি মোটর গাড়ীতে করে পাঠিয়ে

দেয় তাহলে সমস্যা কি? এমনটি করার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য স্রেফ এটাই যে, এরা কিছু তো নিচে নামুক।"

ফলশ্রুতিতে পরের দিন নবাব সাহেব তাঁর স্ত্রী সহ নিজেই আগমন করেন। ওযরখাহী করে বলেন : আমাদেরকে মাফ করে দিন। আমার তো নিজেই উপস্থিত হওয়ার দরকার ছিল। আমি অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম।

যাই হোক, হযরত আকদাস রায়পুরী রহ. নবাব সাহেবের সাথে খুবই আন্তরিকতা পূর্ণ আচরণ করলেন।

পরবর্তী বৃহস্পতিবার পুনরায় দাওয়াতের জন্য রায়পুরের কুঠিতে বেগম সাহেবা নিজে আরয করলেন এবং হযরতের নিকট বাইআতও হলেন। হযরত তাঁকে কিছু পড়ার জন্য বলে দিলেন।

বেগম সাহেবা বললেন : হযরত! আমার স্বামী নবাব সাহেব তো নামাযই পড়েন না! শুধু এ জন্যই কথাটা আরয করেছেন যাতে করে নবাব সাহেব নিজ অবস্থান থেকে আরো নিচে নেমে আসেন। এবং হযরতের কাছে বাইআত হয়ে যান।

হযরতওয়ালা কবূল করে নিলেন। এরপর তো নবাব সাহেব নিজেই খাওয়ার মধ্যে শরীক হলেন। এবং বাইআতও হয়ে গেলেন। হযরতের দারুণ ভক্ত হয়ে পড়েন তিনি।

আল্লাহ তাআলা হযরতওয়ালাকে অনুপম চরিত্র মাধুরীর এত বেশি অংশ দান করেছিলেন যে, অন্যরা এটা কল্পনাও করতে পারবে না।

১২. একমাত্র আল্লাহ পাকের উপরই ভরসা করতে হবে

দেশ ভাগের পূর্বে (১৯৪৭ খৃ. এর পূর্বে) হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. সন্ধ্যার খানা খেয়ে আমাকে (সংকলক) কাছে ডেকে বসাতেন এবং এ আয়াতে মুবারকা তিলাওয়াত করাতেন :

وَ قَضَيْنَاۤ اِلٰى بَنِیْۤ اِسْرَآءِيْلَ فِی الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا○ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَاۤ اُولِیْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ وَ كَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا○

অর্থাৎ "আর আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবের মধ্যে এটা বলে দিয়েছিলাম যে, তোমরা জমিনে দুইবার অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং অতিশয় বল

প্রয়োগ করতে থাকবে। অতঃপর যখন এতদুভয়ের প্রথমবারের প্রতিশ্রুতি সমাগত হবে (তখন) তোমাদের উপর আমার এমন বান্দাগণকে ক্ষমতাশালী করে দিব যারা ভীষণ যোদ্ধা হবে। তখন তারা তোমাদের ঘরে ঢুকে পড়বে। আর এটা এমন একটি ওয়াদা যা অবশ্যই ঘটবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৪-৫)

আয়াতদ্বয়ের তরজমা করাতেন এবং বলতেন : عِبَادًا لَنَا বা "আমার বান্দাগণ" দ্বারা উদ্দেশ্য কি? আমি আরয করতাম যে, হযরত শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী রহ. "اپنے بندے" "আমার বান্দাগণ" এ তরজমা করেছেন।

হাযারাতে মুফাসসিরীনে কেরাম এ আয়াতে কারীমার তাফসীরে লিখেন : "আমার বান্দাগণ" দ্বারা উদ্দেশ্য হল বুখতে নাসসর, যে মূর্তি পূজক বাদশাহ ছিল এবং বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

বুঝা গেল যে, নবীর ছেলেরাও যদি আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করে, তাহলে মুশরিকদের মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। আমাদের বর্তমান অবস্থাও অনুরূপ হয়ে গেছে। প্রত্যেক ব্যাপারে আমরা শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। আল্লাহ পাক আমাদের উপর দয়া করেন যেন মার খেতে না হয়।

ভাই আলতাফকে লক্ষ্য করে হযরতওয়ালা বলতেন : আরে আলতাফ! যা করার জলদী জলদী করে নাও। জানা নাই কী ঘটতে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেটাই হল যা হওয়ার ছিল এবং খুব মারপিট হল (সম্ভবত : ১৯৪৭ ইং সালের ভয়াবহ দাঙ্গার দিকে ইঙ্গিত যখন হাজার হাজার মুসলিম হিন্দু মুশরিকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন [অনুবাদক]) তারপরও আমাদের বুঝে আসল না।

হযরতওয়ালা রহ. বলতেন যে, যদি আমরা শুধু বর্তমান অবস্থা থেকেই শিক্ষা নিতাম এবং মুরাকাবা করতাম, তাহলে এর মধ্যেও অনেক বড় সবক ছিল যে, "যখন যেমন কর্ম তেমন ফল" এটাই আসল কথা সাব্যস্ত, তখন নিজের স্বার্থেই নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করা অনুচিত। সময়মত কেউ কাজে আসে না। না বাপ, না ভাই, না ছেলে, না মেয়ে, চাই যত প্রিয়ই হোক না কেন। দুঃখ ব্যথার সময় কাজে আসে না। ৪৭ এর দেশ ভাগের সময় সবকিছু পরিষ্কার হয়ে সামনে এসে গেছে। এ জন্য নিজের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং তাঁকেই নিজের কল্যাণকারী মনে করবে। কারো উপর ভরসা করবে না। একমাত্র আল্লাহ পাকের উপরই তাওয়াক্কুল করবে। পরিশেষে তাঁর নিকটেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তাহলে জীবদ্দশাতেই

আমরা তাঁর হব না কেন? যদি এই যিন্দেগীতে ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্ক হয়ে যায় তাহলে কবরে সাচ্ছন্দ্য বোধ করবে ইনশাআল্লাহ। তাঁর কবরে কোন ভয় হবে না। মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় সে ঘাবড়াবে না। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর পূর্ব থেকেই ঈমান আছে। যদি রাব্বুল আলামীনের উপর দুনিয়াতে ইয়াকীন থাকে অর্থাৎ এ বিশ্বাস আছে যে, আমার রব আমাকে রূযী পৌঁছান। আমার করা না করার দ্বারা কিছু হয় না। আসমান থেকে রূযী অবতরণ করে আমার রব আমাকে রূযী পৌঁছান, এই ইয়াকীন যদি পয়দা করে নেয় তাহলে আর তার আখেরাতে কিসের ভয়?

আমাদের তো আল্লাহ তাআলার উপর এতটুকু তাওয়াক্কুল ও ভরসাও নেই, যতটুকু মেহমানের মেযবানের উপর থাকে। যতটুকু ছোট শিশুর তার আব্বা-আম্মার উপর থাকে। আমরা তো ঈমান আনা সত্ত্বেও এই আস্থাই রাখি না যে, আমাদের কোন রব আছে। যিনি আমাদের সাথে রূযীর ওয়াদা করেন, না আখেরাতে জবাবদিহিতার উপর ইয়াকীন আছে।

এটা তো ঠিক যে, আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল দয়ালু। কিন্তু তিনি আমাদের উপর তাঁর ইবাদতও তো ফরয করেছেন। এটা মানাও তো ফরয। এ জন্য আমাদের ইয়াকীন আসে না যে, ইবাদত করলে ক্ষমা করে দেয়া হবে, নেক কাজ করা ফরয। আর শিরক, কুফর ও গুনাহ থেকে বাঁচাও ফরয। ঈমান হল ভয় ও আশার মাঝামাঝি অবস্থানের নাম। নেক কাজ করবে এবং আল্লাহ তাআলার রহম ও করমের উপর আশা রাখবে। আর সব সময় তাঁকে ভয় করবে। বান্দার সর্বাবস্থায় নিজ বন্দেগীর স্বীকারোক্তি ব্যতীত কোন উপায় নেই। কিন্তু নিজ আমলের উপর অহংকার করা ঠিক নয়। নতুবা পতন অনিবার্য। এটা একমাত্র মহান আল্লাহর অনুগ্রহ যে, নেক কাজের তাওফীক হয়েছে।

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাআলা যদি আমাদেরকে সুপথে পরিচালনা না করতেন, তাহলে আমরা সুপথ পেতাম না।" (সূরা আরাফ : ৪৩)

কুরআনে পাক ঘোষণা করছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) সব সময় আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করেন, নিজের দিকে কোন কাজের সম্বন্ধ করবে না বরং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার দান মনে করবে।

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ
مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا

আল্লাহ তাআলা বলেন : "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো জিহাদের হক আদায় করে। তিনিই তোমাদেরকে নির্বাচন করেছেন। দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন অসুবিধা রাখেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীম এর মিল্লাতের উপর তোমরা কায়েম থাক; তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে মুসলমান নামে নামকরণ করেছেন (কুরআন নাযিলের) পূর্বেও এবং এর (কুরআনের) মধ্যেও"। (সূরা হজ্ব : ৭৮)

'জুহদ' বা 'জাহদ' মানে হল খাঁটি নিয়্যতে নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদা করা। এটা জিহাদে আকবার বা বড় জিহাদ। অর্থাৎ নিজ সামর্থ অনুসারে কষ্ট ও মেহনত করতে হবে। কথা কাজ ও প্রতিটি হালতে 'ইখলাস' থাকতে হবে। আর এটা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং প্রবৃত্তির অনুসরণের বিরোধিতা দ্বারা অর্জিত হয়। ইখলাস নসীব হয় কলবের পরিচ্ছন্নতা এবং নিজ নফসকে মিটিয়ে দেয়ার দ্বারা। আর এটা সব সময় নফসে আম্মারার বিরুদ্ধে জিহাদের দ্বারা নসীব হয়ে যায়। শর্ত হল গভীর জ্ঞানের অধিকারী শাইখে কামিলের সাহচর্য নসীব হতে হবে। তাঁদের সীনা থেকে নূর নিতে থাকবে। কেননা সূফী যখন স্বীয় নফসকে মিটানো এবং কলবের পরিচ্ছন্নতার পর মুখলিসীনের মধ্য থেকে হয়ে যান, তখন আর তার মধ্যে তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া থাকে না। এবং তাঁর ইবাদত রিয়া বা লৌকিকতামুক্ত হয়ে যায়।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِءٍ مَّا نَوٰى

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই মানুষের আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ সেটাই পাবে যেটার নিয়্যত সে করেছে।" (সহীহ বুখারী)

নিয়্যত যখন পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। তখন তাঁর ইবাদত আল্লাহ তাআলার আনুগত্যশীল হয়ে যায়। ফলে সে আর অবাধ্য হয় না। আর নিঃসন্দেহে এটা "জিহাদে আকবার"। উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় যেটার উল্লেখ আছে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এটাই যে, কামেল মুকাম্মাল শাইখের সান্নিধ্য ব্যতীত এ দৌলত নসীব হয় না।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সান্নিধ্যের বরকতে সাহাবায়ে কেরামের রাযি. অন্তর মুহূর্তের মধ্যেই পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের অবস্থা সে রকম নয়। আমাদের দীর্ঘ সান্নিধ্যের প্রয়োজন। তাঁরা তো জাহেরী ও বাতেনী তথা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত ইলম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাসিল করেছিলেন। তাঁরা তো সূর্যের সামনে ছিলেন। আর আমরা তো সবাই অন্ধকার রাতে নিমজ্জিত। যমানায়ে নবুওয়াতের সাথে দূরত্ব যত বাড়তে থাকবে। অন্ধকার তত বাড়তে থাকবে।

১৩. বাইআত হওয়ার আসল উদ্দেশ্য হল সৎসঙ্গ অর্জন করা

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : বাইআত হওয়র দ্বারা আসল উদ্দেশ্য তো হল সৎ সঙ্গ অর্জন করা। মানুষ তার পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। চাই সে সেটা বুঝুক বা না বুঝুক। দেখুন! পাহাড়ী এলাকার মানুষ সাধারণত: মাঠে-ময়দানে বসবাসকারী মানুষের চেয়ে বেশি কঠিন হৃদয়ের অধিকারী হয়। এর কারণও এটাই যে, সব সময় পাথরের মধ্যে থেকে অন্তর শক্ত হয়ে যায়। শহরের মানুষ সাধারণত গ্রামের মানুষের চেয়ে বেশি সভ্য হয় একগুয়ে হয় না। কথা বুঝে। আল্লাহ পাক বলেন :

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ

অর্থাৎ, "পল্লীবাসী লোকেরা কুফর ও কপটতায় অতি কঠোর, আর তারা আল্লাহ তার রাসূলের উপর যা কিছু নাযিল করেছেন, সেটার সীমারেখাসমূহ না জানারই বেশি উপযুক্ত। (সূরা তাওবা, আয়াত : ৯৭)

আমরা শিশুদেরকে দুষ্ট শিশুদের সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখি। এর কারণও এটাই যে, যাতে করে ঐ দুষ্ট ছেলেটির বদস্বভাব এ ছেলেদের মধ্যে সংক্রামিত না হয়।

শরীয়তে ইসলামী জামাআতের সাথে নামায আদায়ের ব্যাপারে তাকীদ করেছে। কেননা জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে তার মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়বে। ইরশাদ হচ্ছে : وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ "এবং তোমরা রুকু করো রুকুকারীদের সাথে"। (সূরা বাকারাহ : ৪৩) অর্থাৎ জামাআতের সাথে নামায আদায় করো।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর মধ্যে কেউ নামাযের জামাআতে শরীক না হলে, তাঁর শরীর-স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য তাঁর বাসায় যাওয়া হত।

শরীয়ত আযানের ব্যবস্থা এ জন্যই রেখেছে যাতে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। একজনের উপর অন্যজনের নামাযের প্রভাব পড়বে। যে জামাআতের সাথে নামায আদায় করে, সে উত্তম নামায পড়ে। কেননা এখানে অপর ভাই থেকে উপকৃত হওয়ার বেশি সুযোগ পাওয়া যায়। এক সাথে বসে যিকির করার দ্বারাও একজনের অন্তরের ছাপ অন্যজনের উপর পড়ে। এবং অন্তরের একাগ্রতা নসীব হয়।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন : একা একা অনুচ্চস্বরে বসে যিকির করার তুলনায় কয়েকজন মিলে যিকির করা অনেক বেশি উত্তম। কেননা এর প্রভাব সুদূর প্রসারী হয়। উচ্চস্বরে যিকির করলে মন এদিক সেদিক ছুটোছুটি করে না। বর্তমানে মানুষের তবিয়ত পূর্বের তুলনায় শীতল। এ জন্য উচ্চস্বরে যিকির করা অধিক ক্রিয়াশীল হয়। কলবের মধ্যে উষ্ণতা সৃষ্টি হয়। তবে হ্যাঁ সীমা লংঘনকারী উচ্চস্বর যেন না হয়।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন : পূর্ববর্তী যুগের সূফীগণ উচ্চস্বরেই যিকির করতেন। হযরত খাজা নকশবন্দী রহ.-এর যমানা আসল, তো তিনি অনুচ্চস্বরে যিকিরকে পসন্দ করলেন,

হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ. নিজ ফাতওয়ায় এটাকে "ভাল" লিখেছেন। যিকির যখন অন্তরে খুব বদ্ধমূল হবে আর শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে যিকিরের আওয়ায আসতে থাকবে, তখন অনুচ্চস্বরে যিকির করা চাই। যখন এই কাইফিত বা বিশেষ অবস্থা খুব পোক্ত হয়ে যাবে, তখন ইসম থেকে মুসাম্মার দিকে চলবে অর্থাৎ নাম থেকে নামযুক্ত সত্তার দিকে অগ্রসর হবে যে, যা কিছু ইবাদত বন্দেগী হচ্ছে, ফারায়েয-ওয়াজিবাত ও মুসতাহাব্বাত হচ্ছে, সেগুলো আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। এই কাইফিয়তও খুব পোক্ত হয়ে যাবে এবং বিনা ইচ্ছায় হতে থাকবে, তখন এই খেয়াল করবে যে, নেয়ামত যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে সেটা মহাদানশীল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসছে।

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ

"আর তোমাদের নিকট যত নেয়ামত আসে, সব আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।" (সূরা নাহল : ৫৩)

সব খেয়ালসমূহের কারিশমা। আসলে যখন আল্লাহ তাআলার ইশক নসীব হয়, তখন এর বিপরীতে সবকিছু তুচ্ছ।

আমার বড় তাজ্জব লাগে যখন শুনি কোন কোন লোক বলে যে, আমাদের মুরাকাবার (বিশেষ ধ্যান) সময় খুব ঘুম আসে! আরে যদি প্রকৃত মুরাকাবা নসীব হয়, তাহলে নিদ্রা কোত্থেকে আসবে?

আসলে এটা হল মহান আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির পথ। মজদুরী এবং সাওয়াবের পথ নয়। তবে মালিকুল মুলক যদি সাওয়াবও দান করেন আর নৈকট্যের দ্বারাও ধন্য করেন, তাহলে সেটা হল তাঁর সীমাহীন করুণা।

১৪. মাওলানা রূমী রহ. এর ব্যাপারে হযরত ফরীদুদ্দীন আত্তার রহ. এর ভবিষ্যদ্বাণী

যখন মাওলানা রূমী রহ. এর আব্বাজান হযরত শাইখ ফরীদুদ্দীন আত্তার রহ. এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন : "আপনার এই ছেলে একদিন বড় হবে।"

শাইখ আত্তার রহ. তো সাত মহাদেশ এর ইশকের বাদশাহ ছিলেন।

শাইখ আত্তার রহ. বলতেন : যখন তুমি সব জিনিসের চিন্তায় বিভোর, তখন তুমি আল্লাহ পাকের প্রকৃত বান্দা কবে হবে, এ জন্য সবার উপর জানাযার নামায পড়ে দাও। একমাত্র মালিকুল মুলক বা রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক জুড়ে নাও।

لا এর নফীর অধীনে নিজেকেও আন যে, আমিও নেই। শুধুমাত্র একজন সত্তাই আছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সাথে ইশক বা গভীর প্রেমের সম্পর্ক না হবে, অতক্ষণ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হবে না।

ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

অর্থাৎ, আমাদের অসম্পূর্ণ ইশকের দ্বারা ঐ মাহবূবে হাকীকী বা প্রকৃত প্রেমাস্পদ আল্লাহ তাআলাকে পাওয়া যাবে না।

মাওলানা আবদুল্লাহ ছাহেব ফারূকী (রহ.)কে লক্ষ্য করে হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলতেন : আপনার আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা উচিত। আপনাকে ব্যথা ভরা নরম একটি অন্তর দান করা হয়েছে।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। একবার মাওলানা আব্দুল্লাহ ছাহেব ঢাডী র.-এর উপস্থিতিতে বললেন যে, "মাওলানা ওয়ালী মুহাম্মাদ জালন্ধরীকে বলবেন যে

غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو
جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے

অর্থাৎ, একসাতে বসতে পারাকে তুমি সুবর্ণ সুযোগ মনে কর। কেননা বিচ্ছেদ মুহূর্ত শিয়রে দণ্ডায়মান।

১৫. আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের সাহচর্য অত্যন্ত ক্রিয়াশীল জিনিস

সম্ভবত ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। আসরের নামাযের পর হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এমন কিছু বললেন যে, সবাই কেঁদে ফেললেন। বিশেষত অধম (সংকলক) এর উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া হল।

সকালে ফজর নামাযের পর যখন মজলিস হল, তখন আমি হাফেয শীরাযী রহ. এর এই কবিতা পাঠ করলাম :

ازیں افیوں کہ ساقی درمے افگند + حریفاں را نہ سر ماند نہ دستار

মাওলানা আব্দুল্লাহ ছাহেব এবং হযরত মাওলানা গোলাম রাসূল ছাহেব যিনি হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ ফারুকী ছাহেবের দাদা ছিলেন। অত্যন্ত দয়ালু মানুষ ছিলেন। রায়পুরের সকল জামাআতের উসতাদ এবং হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফাদের মধ্যে একজন ছিলেন। অনেক উঁচু পর্যায়ের আশেক ছিলেন। মাওলানা গোলাম রাসূল ছাহেব তাঁর হাতে তাওবা করেছিলেন। অতঃপর হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর খেদমতে গিয়ে মুরীদ হয়ে যান।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : বাস্তবেই মাওলানা মুহাম্মাদ ছাহেব তো অনেক বড় আশেকদের মধ্যে ছিলেন। আমি সাহারানপুরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছি। ব্যস সারা রাত শুধু কাঁদছিলেন আর কাঁদছিলেন। যখন যিকির আরম্ভ করতেন, তখন এই কবিতাটি পাঠ করতেন :

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

অর্থাৎ, মেশক ও গোলাপের পানি দ্বারা এই মুখ সহস্রবার ধৌত করেছি। এখানো তোমার (আল্লাহ পাকের) নাম মুখে আনা পরিপূর্ণ বে আদবীই বটে।

যে একবার মাওলানার ওয়ায শুনে নিত। তার তাহাজ্জুদ নামায কখনো ছুটত না। অত্যন্ত সংক্রামক ইশক ছিল। কোন কোন বুযুর্গের নিসবত লাযেমী

হয় অর্থাৎ তিনি নিজে বুযুর্গ বটে কিন্তু অন্যকে এমন বানাতেন না। আবার অনেকের নিসবত মুতাআদ্দী বা সংক্রামক হয় যে, অন্যকেও এ রঙ্গে রঙ্গীন করে দেন।

কবি বলেন :

یک زمانہ صحبتے با اولیاء + بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
گر تو سنگ خوارۂ مرمر شوی + چوں بصاحبدل رسی گوہر شوی

অর্থাৎ, আউলিয়ায়ে কেরামের সামান্য মুহূর্ত সান্নিধ্য, শত বৎসর রিয়াবিহীন ইবাদতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

যদি তুমি অমসৃণ মর্মর পাথরও হও, যখন ছাহেবে দিল কোন বুযুর্গের সান্নিধ্যে যাবে রত্ন বনে যাবে।

আল্লাহর ওলীদের সাহচর্যে দারুণ ক্রিয়া রয়েছে। মানুষ অন্যের আখলাকের প্রতি আকৃষ্ট হয় যদিও অবচেতনভাবেই হোক না কেন। তারপরও সান্নিধ্যের ক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে।

এই যে একটি কবিতা প্রসিদ্ধ :

.برزبان تسبیح و در دل گاؤخر + ایں چنیں تسبیح کئے دارد اثر

অর্থাৎ মুখে তাসবীহ আর অন্তরে গরু-গাধা অর্থাৎ দুনিয়া, এ জাতীয় তাসবীহ কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে? আমরা তো এর উল্টো অবস্থাতেও প্রতিক্রিয়া দেখেছি। ایں چنیں تسبیح ہم دارد اثر বা এ জাতীয় তাসবীহও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

যখন আমরা নামাযের ছানার মধ্যে وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ এবং "আপনার নামও বরকতময়" প্রতিদিন পাঠ করি। সূরায়ে আর রহমানে আছে

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ۝

"আপনার প্রভুর নাম কত বরকতময় যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।"

(সূরা আর রহমান : ৭৮)

তাহলে আল্লাহর নাম কবে প্রতিক্রিয়া শূন্য হল? ঔষধের প্রতিক্রিয়া যদি জানা নাও থাকে, তারপরও ঔষধ ক্রিয়া তো অবশ্যই করে। তাহলে আল্লাহর নামের কোন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া থাকবে না? হ্যাঁ, যদি মনোযোগ থাকে, তাহলে তো "নূরুন আলা নূর" বা সোনায় সোহাগা।

১৬. হযরতওয়ালা আবদুর রহীম রায়পুরীর রহ. সাহচর্যের প্রভাব

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন যে, সূফী আব্দুল হামীদ ছাহেবের আব্বা আমাদের হযরত (মাওলানা আব্দুর রহীম ছাহেব রায়পুরী রহ.) এর খেদমতে আসলেন তো ইংলিশ হেট ও কোট পাতলূন পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। হযরত কোন আপত্তি করেননি। খুব আদর যত্নে রেখেছেন। কয়েকদিন থেকে চলে গেছেন।

এরপরে যখন দ্বিতীয়বার এসেছেন আমি চিনতে পারিনি। পাজামা পরিহিত টাখনু উন্মুক্ত। সেরকম জুতা লাঠির সাথে বদনা ঝুলানো। মাথায় দু পয়সার টুপি, গায়ে লম্বা কুর্তা।

আমরা দেখে হতভম্ব হয়ে গেছি। জিজ্ঞাসা করলাম : চৌধুরী সাহেব! ঐ ফ্যাশনযুক্ত পোষাক কোথায়? বললেন : "ঐ বৃদ্ধ লোকটি কিছু একটা করে দিয়েছেন"।

ব্যস ঐ পোষাকের সাথে ঘৃণাই সৃষ্টি হয়ে গেছে। এরপর তো কায়া পাল্টে গেছে। ভাওয়ালপুর রাজ্যে ডিস্ট্রিক জজ ছিলেন। একেবারেই সাদাসিদে চলতেন। তাহাজ্জুদ গুযার, যিকির শোগলকারী সাধারণ খানা খানেওয়ালা দরবেশ প্রকৃতির মানুষ বনে যান।

আমাদের হযরত তাঁকে ইজাযতও প্রদান করেছিলেন যে, চৌধুরী আলম আলীকে বলতে যে, আপনি যেভাবে চলছেন চলতে থাকুন। আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর নাম জিজ্ঞেস করলে বাতলে দিবেন। নিজে মুজতাহিদ বনে যাবেন না। শাইখের নিকট আসতে থাকবেন এবং নিজের অবস্থা উল্লেখ করতে থাকবেন। শাইখকে আয়নার মত মনে করবেন। এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ। দোষ দেখে, কিন্তু অন্যের কাছে প্রকাশ করে না।

মানুষ অনেক সময় নাজায়েয কাজ করতে থাকে। আর এটাকে কৃতিত্ব মনে করে! শাইখ তাকে অবহিত করে ও সংশোধন করে। এজন্যই পীর থাকা জরুরী।

১৭. জনৈক হিন্দু রাজার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

সম্ভবত ১৯৪০ ঈসায়ী সালে হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. রায়পুরে বলেছিলেন যে, ঐ হযরত মাখদূম জাহানিয়াঁ জাহাঁগাশত হযরত জালালুদ্দীন বুখারী রহ. গোজার সম্প্রদায়, জাট রাজপুত যারা সোয়ালিক পাহাড়ের

পাদদেশে বসবাস করতেন। হযরত জালালুদ্দীন বুখারী রহ. এর সাহচর্যের বরকতে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হযরত মাখদূম জাহানিয়াঁ যখন হরিদওয়ারের কাছাকাছি জোয়ালাপুর গমন করেন, তখন গ্রামের বাইরে এক পাহাড়ে ডেরা স্থাপন করেন। লোকজন সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলেন। এই রাজা নিঃসন্তান ছিলেন। নিজের রানীকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। আরয করলেন : হযরত! আমাদের জন্য দু'আ করুন যেন খোদা তাআলা আমাদেরকে পুত্র সন্তান দান করেন। বুযুর্গ বললেন : দু'আ করতে পারি। একটি শর্ত আছে। তোমাদের প্রথম যে পুত্রটা হবে, তাকে আমি নিব। রাজা কবূল করে নিলেন। বুযুর্গ দু'আ করলেন এবং বললেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে দুটো পুত্র সন্তান দান করবেন। অতঃপর তিনি কিছুদিন অবস্থান করে চলে যান। সতের বছর পর পুনরায় ফিরে আসেন। রাজা এবং রানী এ কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়ে যে, ওয়াদা অনুযায়ী তো আমাদের এ ছেলেটাকে নিয়ে হযরতের কাছে যাওয়া উচিত। পরে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, ছোট ছেলেকে ঐ বুযুর্গের নিকট নিয়ে যাবে। যখন তারা হযরতের খেদমতে পৌঁছল, হযরত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন : এটাতো ঐ ছেলে নয়। রাজা রাণী সাংঘাতিক লজ্জিত হলেন।

এ দিকে ঐ বড় ছেলের পেটে এমন ব্যথা উঠল যে, সংবাদ আসল ছেলে মৃত্যু পথযাত্রী। অপারগ হয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ ছেলেকে এনে হযরতের নিকট পেশ করে দিল। হযরত রহ. বললেন : এখন ঠিক আছে। এরপর বললেন : তোমাদের ঐ ওয়াদা মনে আছে? রাজা বললেন : হযরত খুব মনে আছে। হযরত বললেন : সেই ওয়াদা পুরা কর। সঙ্গে সঙ্গে রাজা ছেলেকে হযরতের নিকট হস্তান্তর করল। হযরত বললেন : তুমি পড় কালিমায়ে তায়্যিবাহ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর কাঁচি দ্বারা তার মাথার উপরের চুলগুলো কেটে দিলেন এবং তাঁকে নিজের কাছে বসালেন।

ঘরে গিয়ে রাণী বললেন : আমরা হিন্দু থেকে কী করব? আমাদের মুসলমান হয়ে যাওয়া উচিত। সন্ধ্যায় উভয়ে এল এবং মুসলমান হয়ে গেল।

এখনো পর্যন্ত জোয়ালাপুরে এই দুই ভাইয়ের বংশধরগণ আছেন। মুসলমানের সন্তানদেরকে মুসলমান রাজপুত বলা হয়। আর হিন্দুর সন্তানদেরকে হিন্দু রাজপুত বলা হয়। পরবর্তীতে আরো অনেকেই মুসলমান হয়ে যায়।

১৮. আসল মাকসূদ হল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : আসল উদ্দেশ্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর যে সব নূর ও কাইফিয়ত পথের মধ্যে সালিক বা আল্লাহর পথের পথিকের নযরে পড়ে, এগুলোর মধ্যে পড়ে থাকা অনুচিত। বরং এ সবের উপর ৴ এর নফী বা নিষেধ টেনে দেয়া উচিত। এই সব গাইরুল্লাহ। আসল মাকসূদ তো হল আল্লাহ পাকের সত্তা। এই সব কাইফিয়াত বা বিশেষ অবস্থা যদি নসীবও হয়ে যায় কিন্তু রেযায়ে মাওলা বা মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি নসীব না হয়, তাহলে সব বৃথা। চেষ্টা করে এ সব কিছুর নফী করবে এবং আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছবে।

এই কাশফ ও কারামাত তো হত্যাকারী বিষ। এগুলোর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করবে না। নতুবা সে তাসাওউফের ময়দানে মারা পড়বে।

نفس و شیطان زد کریما راہ من + رحمتت باشد شفاعت خواہ من

অর্থাৎ, "হে দয়ালু মাওলা! নফস ও শয়তান আমার পথ বন্ধ করে রেখেছে, আপনার রহমতই আমার একমাত্র বাঁচার উপায়।

আল্লাহ তাআলার রহমত ছাড়া কেউ মানযিলে মাকসূদে পৌঁছতে পারবে না। এজন্যই দু'আ করা হয়েছে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

"আপনি আমাদেরকে সরল পথে পরিচালনা করুন। ঐ সব লোকের পথ, যাঁদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন।" (সূরা ফাতিহা ৫-৬)

বুঝা গেল বান্দার চেষ্টা কিছুই করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের রহমত শামিল না থাকে। বেচারা মানুষ একা কী করবে?

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

"আল্লাহ যাকে চান তাকে সরল পথে পরিচালনা করেন।"

(সূরা বাকারাহ : ২১৩)

যা কিছু হয়েছে, হয়েছে আপনার অনুগ্রহে। যা কিছু হবে, হবে আপনারই অনুগ্রহে।

এজন্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ জরুরী। আর সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর অনুসরণ ছাড়া কেউ আরেফ হতে পারেনি। এ কারণেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা পোষণ করা জরুরী।

১৯. সাহাবায়ে কেরামের রাযি. মর্যাদা

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী ও হালাত এর দ্বারা ঈমান-ইয়াকীনের মধ্যে উন্নতি হয় এবং এটা বরকত হাসিলের উপলক্ষও বটে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর হালাত পাঠ করার দ্বারা আমার উপর যে প্রভাব পড়ে, অন্য কারো হালাত দ্বারা আমার উপর সে প্রভাব পড়ে না। এমনকি অনেক সময় দরওয়াযা সম্পূর্ণ বন্ধ করে বসে থাকি এবং সাহাবায়ে কেরামের হালাত পড়ি, তখন তীব্র বেগে কান্না আসে। সুবহানাল্লাহ! সাহাবায়ে কেরামের রাযি. সাথে আবার কে প্রতিদ্বন্দিতা করবে? যাঁদের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে :

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ

অর্থাৎ, "অতএব যারা হিজরত করল এবং নিজেদের বাড়ী ঘর থেকে বিতাড়িত হল এবং আমার পথে যাদেরকে কষ্ট দেয়া হল এবং তারা লড়াই করল ও নিহত হল।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯৫)

লোকেরা বলে : আউলিয়ায়ে কেরামের হালাত শোনান। আমি বলি : সাহাবায়ে কেরামের রাযি. থেকে বড় ওলী আর কে হতে পারে? তাঁদের গোলামীর দ্বারাই তো সবকিছু পাওয়া যায়।

২০. আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মেহমানদারী

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : আমাদের হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব রায়পুরী রহ. এর দাদা হযরত শাহ গোলাম আলী ছাহেব (প্রখ্যাত বুযুর্গ মির্যা মাযহার জানে জাঁনা রহ. এর খাস খাদেম ও খলীফা) এর খাদেমদের মধ্যে ছিলেন। সম্ভবতঃ খলীফাও ছিলেন। পায়ে হেঁটে দিল্লী গিয়ে হযরত গোলাম আলী ছাহেব রহ. এর সাথে জুমুআর নামায আদায় করতেন। একবার সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ইতোমধ্যে তাঁর গ্রাম "তাগড়ী" এর এক বৃদ্ধও পীড়াপীড়ি শুরু করল যে, আমিও আপনার সাথে যাব।

পৌঁছার পর দেখলেন যে, শাহ গোলাম আলী ছাহেব মরহুমের এখানে আহারের কোন ব্যবস্থা নেই। আমার শাইখের দাদা ঐ বৃদ্ধকে বললেন যে, নিন এই দু আনা পয়সা দিয়ে বাজার থেকে কিছু কিনে খেয়ে নিয়েন। আমাদের হযরত (শাহ গোলাম আলী ছাহেব) এর ওখানে এখন অনাহার পরিস্থিতি বিরাজমান। বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : "তাহলে আমিও না খেয়েই

থাকব”। একদিন তো যাইহোক কোনক্রমে পার হয়ে গেছে। পরের দিন ক্ষুধার অভিযোগ করলেন। হযরত এর দাদা ঐ বৃদ্ধকে বললেন : আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম যে, আপনি সহ্য করতে পারবেন না। নিন এই দুই আনা দিয়ে বাজার থেকে কিছু খেয়ে নিন। চুপে চুপেই চলে যান। যখন ঐ বৃদ্ধ দরওয়াযায় গেলেন, তখন একজন দরবেশের সাথে সাক্ষাত হল। দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কোথায় যাচ্ছ? বৃদ্ধ বললেন : ক্ষুধা লেগেছে কিছু একটা খাব। এখানে খানকায় তো এখন অনাহার চলছে। দরবেশ বললেন : মিয়াঁ! তোমার দ্বারা কি এটা সম্ভব নয় যে, তুমিও দরবেশদের সাথেই থাকবে? যখন সবাই খানা খাবে, তখন তুমিও খেয়ে নিবে। লজ্জিত হয়ে ফিরে এসে বসে পড়েছে।

ইত্যবসরে হযরত শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ. হুজরার বাইরে তাশরীফ নিয়ে এলেন। বললেন যে, “সমস্ত যাকিরীনকে ডাকো”। যখন সবাই এসে গেল তখন দু‘আ করলেন : ইয়া আল্লাহ! আমরা ক্ষুধার্ত। আপনি এসব দরবেশদের উসীলায় আমাদেরকে খানা দিন। এরমধ্যে শাহী পেয়াদা পৌঁছে গেল যে, অমুক শাহযাদার ঘরে ছেলে হয়েছে। হযরতের খেদমতে কয়েক ডেগ খানা পাঠানো হল। আর এই টাকাগুলোও হযরতের জন্য হাদিয়া।

হযরত গোলাম আলী রহ. বললেন : টাকা তোমরাই ফেরত নিয়ে যাও। আর খানা আমরা খেয়ে নিচ্ছি।

এরপর সবাই তৃপ্তিসহ খানা খেল।

২১. হযরত শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ. এর একটি ঘটনা

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : হযরত শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ. হযরত মির্যা মাযহার জানে জাঁনা রহ. এর অনেক খেদমত করেছেন। হযরত মির্যা ছাহেব রহ. অত্যন্ত নাযুক স্বভাবের মানুষ ছিলেন।

একবার গোলাম আলী ছাহেব হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন, তখন মির্যা ছাহেব রহ. বললেন : তোমার হাতে কি শক্তি নেই? যখন জোরে জোরে পাখা দুলাতে লাগলেন, তখন বললেন যে, আমাকে উড়িয়ে দিবে নাকি? হযরত শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ. বলে ফেললেন : এভাবেও হয় না ঐভাবেও হয় না অর্থাৎ হাল্কা বাতাস করলেও সমস্যা আবার জোরে বাতাস করলেও অসুবিধা!! সঙ্গে সঙ্গে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে খানকা থেকে বের করে দিয়েছেন আর বলেছেন যে, এখানেও তো এমনিই হবে।

কয়েক দিন পর রাযী হয়ে গেলেন। রাযী হওয়ার পর একদিন বললেন যে, গোলাম আলী! আমি তোমার সাথে যে কঠোরতা করেছি, সেটা তোমার উপকার এর জন্যই করেছি। এখন তুমি মাশাআল্লাহ সফলকাম। যাও, আর আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর নাম জিজ্ঞেস করলে বলে দিবে। অর্থাৎ খেলাফত প্রদান করলেন।

হযরত শাহ গোলাম আলী ছাহেব রহ. কোন একটি বিরান মসজিদে গিয়ে বসে পড়লেন। সেটা পরিষ্কার করলেন এবং ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

হযরত মির্যা ছাহেব রহ. তাঁকে অসিয়ত করেছিলেন যে, কারো দরওয়াযায় যাবে না। তারপর কয়েকদিন অনাহারে থেকেছেন কিন্তু কারো দরওয়াযায় যাননি। শেষে একদিন একজন মানুষ আসলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন যে, কেউ ভেতরে থাকলে খানা নিয়ে নিন। হযরত প্রথমে উঠেছিলেন। পরে বসে গেছেন এটা চিন্তা করে যে, আমার হযরত তো আমাকে কারো দরওয়াযায় যেতে নিষেধ করেছেন। শেষে ঐ আগন্তুক মসজিদের বারান্দায় এসে আওয়ায দিল যে, খানা নিয়ে নাও। আমি উঠে খানা নিয়ে নিলাম। কেননা এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এর অর্থ হল আল্লাহ পাকের নেয়ামতের না শোকরী করা।

অতঃপর তো আল্লাহ তাআলা খুব দিয়েছেন। শত শত মেহমান আসত।

২২. তাওয়াক্কুল শাহ রহ. এর ঘটনা

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : তাওয়াক্কুল শাহ রহ. এর সাথে একজন খাস খাদেম থাকত। অত্যন্ত ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ। হযরতের অভ্যাস ছিল আম্বালা শহরের বাইরে ময়দানে চলে যেতেন। ঐ খাস খাদেম দরবেশও সঙ্গে যেতেন এবং মুরাকাবা করতেন। আর তাওয়াক্কুলের উপর জীবন ধারণ করতেন।

একবার রাত্রে মুরাকাবা বা বিশেষ ধ্যান করছিলেন। উপর থেকে কিছু পতিত হওয়ার আওয়াজ আসল। ফলে তাওয়াক্কুল শাহ রহ. দরবেশকে ডেকে বললেন : দেখ তো কী পড়ল? মনে হচ্ছে ইটের ঢিল। দরবেশ বললেন : হযরত! এগুলো তো স্বর্ণমুদ্রা। বললেন : এখন পরীক্ষা হয়ে গেছে সুতরাং খুব মৌজের সাথে খাও। এখন আল্লাহ পাক রাস্তা খুলে দিয়েছেন। আর কোন পরোয়া নেই ইনশাআল্লাহ।

ফলশ্রুতিতে এমনই হয়েছে, তাঁর দরবারে সব সময় হাজারের উপর মেহমান থাকত।

২৩. তাওয়াক্কুলের সুফল

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : আমাদের অভিজ্ঞতা হল, আল্লাহর বান্দা যদি জঙ্গলের মধ্যেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে বসে যায় এবং আল্লাহ আল্লাহ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা নিজ মাখলূককে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে দেন এবং গায়েব থেকে রূযী পৌঁছান।

এই হল আমাদের বিশ্বাসের পার্থক্য। জনৈক মুরীদ তাঁর শাইখকে জিজ্ঞেস করল : যদি আমি এক ওয়াক্তের রুটি না পাই, তাহলে কী করব? শাইখ বললেন : চিন্তা কর না দ্বিতীয় ওয়াক্তে পাবে। ঐ মুরীদ বলল : যদি দ্বিতীয় ওয়াক্তেও না পাই? শাইখ বললেন : চিন্তা কর না তৃতীয় ওয়াক্তে পাবে। মুরীদ বলল : যদি তৃতীয় ওয়াক্তেও না পাই? শাইখ বললেন : বুঝতে হবে তোমার তাওয়াক্কুল এর মধ্যে কমতি আছে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের উপর আস্থা ও ভরসা নেই।

২৪. ওয়ায-নসীহতে প্রতিক্রিয়া হয় না কেন?

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : হযরত মুনশীজী ছাহেব (মুনশী রহমত আলী ছাহেব রহ.) বড় কাশফ ও কারামাতের অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন। আমার উপস্থিতিতে জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, উলামায়ে কেরাম ওয়ায ও নসীহত করেন কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সেটার কোন প্রতিক্রিয়া হয় না এর কারণ কী? উত্তরে তিনি বললেন : প্রেমাস্পদের প্রতিক্রিয়া প্রেমিকের উপর হয়। আমাদের প্রেমাস্পদ তো হল স্বর্ণ-রূপা ইত্যাদি। দিলের মধ্যে এগুলোর মহব্বত। তাহলে সেই আলেমের ওয়ায দ্বারা কোন প্রতিক্রিয়া হবে কি? প্রথমে এ সব জিনিসের মহব্বত বের করতে হবে। হযরত মুনশীজী ছাহেবের এই উত্তর আমার খুব পসন্দ হয়েছে।

২৫. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর কবিতার প্রতিক্রিয়া

১৯৪২ ঈসায়ী সালে একবার অধম (সংকলক) বাদ আসর ঢাডী শহরে আরয করলাম : হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর একটি ফার্সী কবিতা আছে :

قباحتہائے فعل ما کہ سگ زال عارے دارد
بجز دریائے فضل تو کہ شوید ایں قباحتہا

আমাদের বদআমলের খারাবী এমন যে, কুকুরও এগুলো দেখলে লজ্জা পায়। আপনার অনুগ্রহের সমুদ্র ছাড়া কে এই সব খারাবীগুলো ধৌত করতে পারে?

কবিতাটা শুনে মনটা খুব নরম হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ! বাস্তবেই দারুণ সুন্দর বলেছেন।

অতঃপর হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : হযরত শাহ ছাহেব কাশ্মীরী (রহ.)কে অধিকাংশ সময় সহজ সরল ওয়ায করতে শুনেছি। কিন্তু এমন ক্রিয়াশীল হত যে, শ্রবণকারীরা সবাই কাঁদত।

২৬. জনৈক বুযুর্গের ঘটনা

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : মাওলানা নূর মুহাম্মাদ ছাহেব শাহবায শরীয়তের অনুসরণকারী বড় আলেমে দ্বীন ছিলেন। খুব জালালী তবিয়তের মানুষ ছিলেন। আর মাওলানা মুহাম্মাদ রামাযানও ঐ এলাকার ছিলেন। তিনি "ওয়াহদাতুল উজূদের" মাসআলার উপর "রঙ্গীলী বুলবুল" নামে একটি কিতাব লিখেছেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ রামাযান বড় কাশফ ওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। একবার কোন মসজিদ গিয়েছেন। উযুর জন্য পানি চেয়েছেন। খাদেম মাটির বদনায় পানি এনে দিয়েছে। এতে পানি ঠাণ্ডা হওয়ার পরিবর্তে গরম হয়ে গেছে। মাওলানা বললেন : এই বদনা ঐ মাটির তৈরী, যেই কবরে মৃত ব্যক্তির শাস্তি হচ্ছে। অন্য বদনায় পানি দেয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে পানি ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মাওলানা মুহাম্মাদ রামাযান 'মুহিম' নামক এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর সমালোচনা করা ঠিক নয়। তিনি এবং মাওলানা নূর মুহাম্মাদ উভয়ই "ছাহেবে হাল" বা বিশেষ অবস্থার অধিকারী বুযুর্গ ছিলেন।

২৭. শাইখের কথামত চলা জরুরী

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : হযরত শাইখ আবুদল হক রাদূলভী রহ. নিজ শাইখ শামসুদ্দীন তুরক পানিপথী রহ.-এর সাথে অভিমান করে বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছিলেন। খানকা থেকে বের হওয়া মাত্রই রাস্তা ভুলে গেছেন। রাস্তায় একটি জঙ্গল ছিল। একটি গাছের উপর চড়লেন যে কোন মানুষ দৃষ্টিগোচর হলে তার নিকট রাস্তা জিজ্ঞেস করব। দেখলেন যে, একজন মানুষ আসছে। তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন যে, রাস্তা তো

পেছনেই ভুলে এসেছেন। উদ্দেশ্যে ছিল এই যে, ফিরে যাও। ঐ শাইখের মাধ্যমেই আসল রাস্তার সন্ধান পাবে।

ফিরে গেলেন। গিয়ে দেখেন যে শাইখ দরওয়াযাতেই অপেক্ষারত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। সীনার সাথে লাগিয়ে নিয়েছেন। এবং এখন ইজাযত তথা খেলাফত দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়েছেন।

অধম সংকলক মুহাম্মাদ লায়েলপুরী আরয করছে যে, মাওলানা জামী রহ. বলেছেন :

چو دیدی کار رو در کار گر آر + قیاس کار گر از کار بر دار

অর্থাৎ যখন তুমি কাজ দেখেছ, তো কারিগরের প্রতি মনোযোগী হও। আর কাজের দ্বারাই স্রষ্টার কৃতিত্ব বুঝে আসে।

এটা হল 'মাকামে জমা' অর্থাৎ শাইখকে মাধ্যম বানাবে এবং আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছবে। আর যদি সমষ্টিগত অবস্থায় সকলের প্রতি লক্ষ থাকে, তাহলে এটা হল 'মাকামে জামউল জমা'।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলতেন : হযরত আব্দুল হক রাদূলভী রহ. এর শাইখ শামসুদ্দীন তুরক পানিপথী রহ. তাকে 'মাকামে জামউল জমা'তে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন।

২৮. হযরত শাহ আবুল মাআলী রহ. এবং তাঁর শিষ্য হযরত মীরান ভেক রহ. এর ঘটনা

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : হযরত শাহ আবুল মাআলী আম্বিভী রহ. এর খলীফা ছিলেন হযরত মীরান ভেক রহ. সূফী আব্দুল হামীদ ছাহেবের গ্রাম ঠাসকায় হযরতের মাযার আছে। প্রসিদ্ধ মাযার সাধারণ-বিশেষ তথা সব শ্রেণীর মানুষের যিয়ারতগাহ বা দর্শনস্থল। আমিও (সংকলক) ১৯৩৮ ইং সালে হযরতওয়ালা রহ. এর সঙ্গে ঠাসকায় গিয়েছিলাম।

একবার হযরত শাহ আবুল মাআলী রহ. হযরত মীরান ভেক রহ. এর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বের করে দেন। বাধ্য হয়ে আবার ফিরে এসেছেন। বর্ষা মৌসুমে ছিল।

শাহ আবুল মাআলী রহ. এর ঘর ছিল কাঁচা। বৃষ্টির কারণে মাটি খসে খসে পড়ছিল। স্ত্রী বললেন : একজন মাত্র মুরীদ ছিল। তাকেও বের করে দিলেন। এখন এই ঘরকে কে ঠিক করবে?

এদিকে হযরত মীরান ভেক রহ. এর মনে খেয়াল আসল যে, শাইখের ঘর হয়ত খসে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলেন। যমুনা নদী তখন দারুণ উত্তাল ছিল। সেটা পার হয়ে আম্বিট আসলেন এবং প্রতিবেশীর ঘরের সিঁড়ির মাধ্যমে উপরে উঠে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিলেন।

হযরত আবুল মাআলী রহ. এর স্ত্রী বললেন : কে? যে আমাদের কোঠায় ঘুরাফেরা করছে? হযরত আবুল মাআলী বললেন : ভেকই হবে। অতঃপর উচ্চ আওয়াযে ডাকলেন : ভেক! হযরত মীরান শাহ ভেক রহ. এই আনন্দে যে হযরত আমাকে ডাকছেন সঙ্গে সঙ্গে কোঠার উপর থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে আসলেন। এবং উপস্থিত হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, হযরত শাহ আবুল মাআলী রহ. উঠে তাঁকে সীনার সাথে লাগিয়ে নিলেন। এবং পরবর্তীতে বাইআতের অনুমতি তথা খেলাফত প্রদান করে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন।

সুবহানাল্লাহ! এই হল শাইখ ও মুরশিদের প্রতি সত্যিকারের ইশক।

২৯. সাপের দংশন, পাগলা কুকুরের কামড় ও বিষাক্ত প্রাণীর বিষের তাদবীর

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. একবার আমি অধম (সংকলক)কে, যখন আমি দিল্লীর নিযামুদ্দীনে উপস্থিত ছিলাম বললেন : অন্তরে যে আয়াত আসে সেটাই লিখে দাও। অথবা পড়ে দম করে দাও। ইনশাআল্লাহ সুস্থতা নসীব হবে।

একবার চেহেল কাফ (বা চল্লিশ কাফ সম্বলিত একটি দুআ) كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيكَ এরও অনুমতি দিয়েছিলেন।

আমি একবার আরয করলাম : হযরত আনওয়ার শাহ ছাহেব কাশ্মীরী (রহ.)

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ○ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

অর্থাৎ, "সালাম বর্ষিত হোক নূহের উপর জগৎবাসীর মধ্যে। নিশ্চয়ই আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের মধ্যে একজন"। (সূরা সাফফাত : ৭৯-৮০-৮১)

এ আয়াতগুলো সাত অথবা এগারো বার পড়ে সাপে কাঁটা ব্যক্তির উপর দম করতে বলেছিলেন।

এ কথা শুনে হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন : অবশ্যই এমনটি করবে।

একবার আমি আরয করলাম যে, মাওলানা হুসাইন আলী ছাহেব রহ. পাগলা কুকুর অথবা বিষাক্ত কোন প্রাণীর দংশনে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য লবণের উপর দম করে দিতেন। আর বলতেন যে, অসুস্থ ব্যক্তিকে এ পরিমাণ খাওয়াবে যাতে তার 'দাস্ত' বা পাতলা পায়খানা আরম্ভ হয়ে যায়। যখন দাস্ত হতে থাকে, তখন বিষ নেমে যায়।

সূরা ফাতিহা এবং ইখলাস তিন বার করে পড়বে।

হযরত শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ. অধিকাংশ সময় এ আয়াত লিখে দিতেন :

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۝ وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۝

"আমি বললাম : হে আগুন! তুমি শীতল ও প্রশান্তিদায়ক হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য। তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, ফলে তাদেরকে আমি ক্ষতিগ্রস্ত বানিয়ে দিয়েছি।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ৬৯-৭০)

এ আমলের মাধ্যমে জ্বর নেমে যেত।

৩০. পেরেশানী থেকে মুক্তির তাদবীর

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. যারা তাঁর নিকট স্বীয় পেরেশানীর কথা বলত, তাদেরকে يَا مُغْنِيُ পড়ার জন্য বলতেন। আর বলতেন যে এক দুই চিল্লা এর উপর আমল কর। ইশরাক বা চাশতের সময় দুই রাকাত নামায পড়ে এক হাজার বার يَا مُغْنِيُ পাঠ করবে। এরপর আবার দুই রাকাত নামায পড়ে يَا مُغْنِيُ এক হাজার বার পড়বে অতঃপর দুই রাকাত নামায পড়ে ৩৬০ বার يَا مُغْنِيُ পড়বে। এভাবে দুই তিন চিল্লা পুরা করবে।

হযরতওয়ালা রহ. বলতেন : যিকিরের আধিক্যের দ্বারাই সবকিছু হয়। আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য পড়বে। কোন জিনিসের ক্ষুধা থাকবে না। যে ব্যক্তি নিজের মালিক আল্লাহ তাআলাকে রাযী করে ফেলেছে, তাঁর আর কী বাকী থাকল? সমস্ত সাম্রাজ্যের মালিক মহান আল্লাহর মর্জির উপর সন্তুষ্ট থাকাই সর্বোচ্চ ব্যাপার।

৩১. যে ইলম আল্লাহর দিকে পথ দেখায় না সেটা মূর্খতা

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. "আনফাসুল আরেফীন" গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমার আব্বাজান (হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব রহ.) আল্লামা মীর যাহেদ হারাভী

রহ. এর নিকট সবক পড়ে ফিরছিলেন। ইত্যবসরে শাইখ সাদী রহ. এর 'রুবায়ী' তাঁর যবানে চালু হয়ে গেল। তিনি পড়তে লাগলেন

جز ذکر دوست ہر چہ کئ عمر ضائع است + جذ سر عشق ہر چہ بخوابی بطالت است

سعدی بشوی لوح دل را از نقش غیر حق + علمیکہ رہ بحق نہ نماید جہالت است

কবিতাগুলোর মর্মার্থ হল : মহান আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য কিছুর পেছনে পড়ার মানেই হল জীবন নষ্ট করা। আল্লাহ পাকের ইশক ব্যতীত অন্য সব কিছুর সাথে সম্পর্ক বাতিল। হে সাদী! তুমি তোমার অন্তরকে গাইরুল্লাহর নকশা থেকে ধুয়ে ফেল, কেননা যে ইলম আল্লাহর দিকে পথ দেখায়না সেটাই মূর্খতা।

প্রথম তিন পঙতি মনে পড়ছিল। চতুর্থ পঙতিটি যবানে আসছিল না। হঠাৎ এক নূরানী শরীর আত্মপ্রকাশ করল। তিনি পড়লেন

علمیکہ رہ بحق نہ نماید جہالت است

অর্থাৎ, ঐ ইলম যা আল্লাহর পথে মানুষকে পরিচালনা করে না, সেটা ইলম নয় বরং জাহালাত বা মূর্খতা।

আমি খুশী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কোন্ বুযুর্গ? এ প্রশ্ন শোনা মাত্রই আগন্তুক দ্রুত লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগলেন আমি সাথে সাথে দৌড়াতে থাকলাম। তিনি আরো দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে গেলেন এমনকি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অধম (সংকলক) জিজ্ঞেস করলাম যে, হযরত! এটা কী হল? হযরতওয়ালা রহ. বললেন : এখানে 'রূহ' আকৃতিসম্পন্ন হয়ে গেছে। যেমনটি আখেরাতে সমস্ত أعراض বা অন্য কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত বস্তু جواهر বা স্বয়ং সম্পূর্ণ বস্তু বনে যাবে। এমনিভাবে রূহের শরীর বা আকৃতি সম্পন্ন হওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কোন বান্দাকে এভাবেও তারবিয়ত করতে সক্ষম।

এ প্রসঙ্গেই একটি ঘটনা। হযরত ভাওয়াল নগরী রহ. বলেন : আমি দিল্লীতে হাদীস পড়াচ্ছিলাম। যার মধ্যে এটা আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে পেয়ালা ছিল, দশ জন মানুষ সেটাকে উঠাতেন। আমি হাসছিলাম যে, এমন পেয়ালাও হয়। হঠাৎ আমার মধ্যে তন্দ্রার ভাব আসল এবং হযরত রায়পুরী রহ. আগমন করলেন, বললেন : "কিতাব আন এবং হাদীস পড়।" আমি কিতাব আনলাম এবং হাদীস পড়লাম। এর মধ্যে قَصْعَةٌ শব্দ ছিল। বললেন : "হে গোস্তাখ! এটার তরজমা কর"। সঙ্গে সঙ্গে

আমার চৈতন্যদয় হল এবং সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল। যেমনটি স্বপ্নের মধ্যে হয়ে থাকে। অনেক সময় জাগ্রত অবস্থায়ও হয়ে যায়।

৩২. নিসবতের মর্ম কি ?

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : হযরত মাওলানা আল্লাহ বখশ ছাহেব ভাওয়াল নগরী রহ. বলতেন : আমার 'নিসবত' এর মর্ম জানা ছিল না। যখন আমার আম্মাজানের ইন্তিকাল হয়ে গেল, তখন আমি রায়পুর থেকে ভাওয়ালনগর গেলাম। তো যে স্থানে আমার আম্মাজান নামায পড়তেন, যেখানে বসতেন ঐ স্থান দেখেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডুকরে ডুকরে কাঁদলাম। যখনই সেখানে যেতাম, এ কাইফিয়ত হয়ে যেত। তখন বুঝে আসল যে, একেই বলে 'নিসবত'।

যখন শাইখের সাথে চরম পর্যায়ের মহব্বত হয়ে যায় এবং তাঁর অনুসরণ করার মধ্যে কোন বানোওয়াটী থাকে না সেটাকেই "নিসবত" বলে। কারো কারো নিসবত এমন হয়। মোটকথা নিজ নিজ সম্পর্কের ভিত্তিতে হয়। কারো "নিসবতে মুহাম্মাদিয়া" হয় আবার কারো হয় "নিসবতে ইলাহিয়্যাহ"।

৩৩. হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ.-এর জ্ঞানের গভীরতা

আমি অধম (সংকলক) একবার মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ১৯৫৫ ঈসায়ীর ঘটনা। লায়েলপুর শহরের সমস্ত ডাক্তার চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। পঁয়ত্রিশ দিন পার হওয়ার পর যখন আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। তখন এক রাতে স্বপ্নে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাত হল, তিনি আসমান থেকে অবতরণ করেছেন তাঁর সঙ্গে সোনালী রঙ্গের অনেকগুলো পতঙ্গও আছে। আমার বিছানায় তাশরীফ আনলেন এবং এ আয়াতে মুবারকা তিলাওয়াত করলেন :

قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ۗ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

অর্থাৎ, "আপনি বলুন, আমি আমার দাওয়াত এর জন্য তোমাদের কাছে কেবল আত্মীয়তা জনিত সৌহার্দ চাই। যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য তাতে পুণ্য বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারী, গুণগ্রাহী।

(সূরা আশ-শূরা : ২৩)

সকালে ফজরের নামাযের সময় আমি সুস্থতা লাভ করি। জ্বর নেমে যায়।

হযরত আকদাস রায়পুরী রহ. এর খেদমতে সমস্ত ঘটনা লিখলাম। সাথে এটাও লিখলাম যে, এর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, তাওয়াক্কুলের কাইফিয়ত বেড়ে গেছে। হযরতওয়ালা বললেন : "খুবই মুবারক অবস্থা, এটাও 'তাজাল্লী' বা এক ধরনের জ্যোতি এবং আপনার উন্নতি হয়েছে।"

অতঃপর হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : যখন সৌদী আরবে নজদীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল এবং হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ ছাহেব সাহারানপুরী রহ. অতঃপর মাদানী রহ. হজ্বে গমন করলেন, আমিও গিয়েছি। ঐ সময় আল তাফুর রহমান, মৌলভী আব্দুল আযীয ছাহেব গুমথালভী, সাঁই সেকান্দার আলী এবং ভাই মুহাম্মাদ আলীও সাথে ছিলেন।

হযরতের আবূ দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'বাযলুল মাজহুদের' যতটুকু অংশ মুদ্রিত হয়েছিল। নজদীরা সেটা কব্জায় নিয়ে নেয়। হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. নিজে সৌদী বাদশাহ ইবনে সউদের সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং কিতাব ছাড়িয়ে এনেছেন।

পরবর্তীতে নজদের আলেমগণ আপত্তি উত্থাপন করলেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নামের সাথে তোমরা 'সায়্যিদুনা' কেন বলো? এর প্রমাণ কোথায় আছে? হযরত সাহারানপুরী রহ. বললেন : হাদীসে পাকে কি এ কথা আসেনি

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَلَا فَخْرَ

অর্থাৎ, "আমি আদম আ.-এর সন্তানদের সরদার কিন্তু এতে গর্বের কিছু নেই।" سَيِّدُ সায়্যিদ শব্দ এসেছে নাকি আসেনি? নজদীরা নিরুত্তর হয়ে গেল।

হযরত সাহারানপুরী রহ. বলতেন : "আল্লাহর কোন বান্দাহ থাকলে তাদের (নজদীদের) সংশোধন করে দিক।"

অথচ হযরত সাহারানপুরী রহ. নিজেও মাশাআল্লাহ কুফর, শিরক ও বিদআতের খণ্ডনে নাঙ্গা তলোয়ার ছিলেন। তারপরও নজদীদের কঠোরতা দেখে এটা বলতেন।

৩৪. হাদীস বিশারদ স্রেফ সৌদীতেই সীমাবদ্ধ নয় এর বাইরেও অনেক হাদীস বিশারদ আছেন

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ভাওয়ালপুরের প্রসিদ্ধ মোকাদ্দমার দিনগুলোতে হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.

বলেছিলেন যে, আমরা খুব তৈয়ার করে মাওলানা শাব্বীর আহমাদ ছাহেব উসমানী (রহ)কে পাঠিয়েছিলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মস্থান অত্যন্ত সম্মানিত স্থান হয়। তাই তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসরার রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস গমন করেন, তখন হযরত জিব্রীল আমীন (আ.) বললেন : হে মুহাম্মাদ! এটা বাইতুল লাহম (বেথেলহেম) যেখানে হযরত ঈসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেছেন। ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বুরাক থেকে অবতরণ করে দুই রাকাত নামায আদায় করেন।

এ হাদীসটি এগারটি কিতাব থেকে বের করে দিয়েছেন।

মাওলানা শাব্বীর আহমাদ ছাহেব উসমানী রহ. বলতেন : যখন আমি ইবনে সউদের সামনে এই হাদীস পাঠ করলাম, তখন তিনি আব্দুল্লাহ বুলাইহাদ রহ. এর দিকে তাকালেন যে, আপনি উত্তর দিন। তো কাযী বুলাইহাদ জিজ্ঞাসা করলেন : এই হাদীস কোন্ কিতাবে আছে? আমি উদ্ধৃতি পেশ করলাম। তখন তিনি কোন উত্তর দিতে পারলেন না। এই প্রেক্ষিতে আমি বাদশাহ ইবনে সউদ (রহ.)কে বললাম : "শুধু নজদ বা সৌদী আরবেই মুহাদ্দিসীন সীমাবদ্ধ নয়, দুনিয়াতে আরো অনেকেই হাদীস জানেন।"

৩৫. পানির মধ্যে শ্বাস নেয়া নিষেধ দম করা নিষেধ নয়

সম্ভবত ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা, যখন হযরত আকদাস রায়পুরী রহ. লায়েলপুর আগমন করেন। তখন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস মরহুম মুরাদাবাদী অসুস্থ ছিলেন। মাওলানা লায়েলপুর জামে মসজিদের খতীব ছিলেন। তাঁর পয়গাম আসল যে, হযরত যেন আমাকে একটু দেখে যান। মাওলানার উপর্যপুরী অনুরোধের প্রেক্ষিতে হযরতওয়ালা তাঁর নিকট গমন করেন। মাওলানা আরয করেন যে, হযরত! আমাকে দম করুন। হযরত দম করে দিলেন। অতঃপর গ্লাসে পানি দিয়ে বললেন : এতেও দম করে দিন। অতঃপর বললেন যে, এখানের আলেমগণ বলেন : পানির মধ্যে তো শ্বাস নেয়া নিষেধ। তাহলে দম করা কিভাবে জায়েয হবে? উত্তরে হযরত রায়পুরী রহ. বললেন : "দেখুন! পানিতে দম করার সময় দম করনেওয়ালার মনোযোগ দেয়া লক্ষ হয়ে থাকে, শুধু শাসই ফেলা লক্ষ্য থাকে না। আর পানি পান করার সময় গ্লাসে শ্বাস ফেলা নিষেধ হওয়া অন্য জিনিস"। মাওলানার দারুণ সান্ত্বনা নসীব হল।

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. বলতেন যে, "তাবীয গ্রহণকারীর উচিত ঐ সময় তাবীয এর ফরমায়েশ করা, যখন তাবীয প্রদানকারীর পূর্ণ মনোযোগ থাকে। তাহলে এর তাৎক্ষণিক আছর হবে ইনশাআল্লাহ। নতুবা যদি তাবীয প্রদানকারীর মনোসংযোগ না থাকে অথবা তিনি গোস্বার অবস্থায় থাকেন, তাহলে কোন আছর হবে না। এমনকি উল্টো ফলাফলও হতে পারে।"

৩৬. যিকির যখন শরীরের অংশ হয়ে যায় তখন অনুভূত হয় না

আমি অধম (সংকলক) একবার আরয করলাম যে হযরত! প্রথম দিকে তো যিকির করার সময় খুব গরম অনুভূত হত। এখন ঐ পরিমাণই যিকির করি, কিন্তু কিছুই অনুভব হয় না। উত্তরে হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন : প্রাথমিক পর্যায়ে যিকির ঠায় পায় না যে কারণে অনুভব হয়, কিন্তু যখন এই যিকিরই শরীরের অংশ হয়ে যায়, তখন আর অনুভবযোগ্য থাকে না। শুধুমাত্র অনুভূতির পার্থক্য। আনওয়ারাতের মধ্যে তো আরো উন্নতি হয়। দেখ! যতক্ষণ খানা হজম না হয়, ততক্ষণ পেটের মধ্যে কষ্ট অনুভব হয়। এটাই কারণ যে, জান্নাতে পেশাব পায়খানা বের হবে না। সবকিছু শরীরের অংশ হয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম)

৩৭. যে জান্নাত চায় সে আসলে আল্লাহকেই চায়

একবার জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন যে, ইবাদত করা, জান্নাত চাওয়ার কথা কুরআনে আযীযের মধ্যে আসে, কিন্তু কতক সূফী বলেন যে, ইবাদত করবে আল্লাহর জন্য নিজের জন্য নয়!! এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপায় কি?

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এর উত্তরে বললেন যে, জান্নাত চাওয়াও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়ারই নামান্তর। জান্নাতও তো মাওলার সন্তুষ্টির স্থান। আর জান্নাতের নেয়ামতসমূহ বাস্তবিক পক্ষে মাওলায়ে কারীমের তাজাল্লীয়াতই বটে বিভিন্ন আকৃতিতে।

আল্লাহর ওলীগণ দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহ পাকের নামের দ্বারাই অন্তরে সুকূন ও প্রশান্তি অনুভব করেন।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর যিকিরের দ্বারা অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।"

(সূরা রা'দ, আয়াত : ২৮)

এটাই আখেরাতে ফল ও বৃক্ষের পোষাক পরিধান করবে। দুনিয়াতে তো আল্লাহর নামসমূহ ও কালিমাতে তায়্যিবাত এর পোষাক পরিধান করেছিল।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

এই তাসবীহগুলো পাঠ করলে জান্নাতে বৃক্ষ তৈরী হয়। যত ইচ্ছা জান্নাতে বৃক্ষ লাগাও। এ বিষয়ে একাধিক হাদীস আছে।

এই কালিমাগুলোই সেখানে বৃক্ষের আকৃতিতে দৃশ্যমান হবে। যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রত্যাশী, সে বাস্তবিকপক্ষে মাওলারই প্রত্যাশী।

হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এবং হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী রহ. মাকতূবাতে শরীফার মধ্যে এটাই লিখেছেন। এখন অবশ্য শব্দগুলো মনে নেই।

ফায়েদা : সুবহানাল্লাহ! অসাধারণ সমাধান পেশ করেছেন। হযরত কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহ. তাফসীরে মাযহারীতে সূরা ইউসুফের তাফসীরে এমনটিই লিখেছেন।

৩৮. শাখা প্রশাখাগত মাসআলায় যথাসম্ভব বিতর্ক এড়িয়ে চলাই নিরাপদ পথ

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : আমি বাঁশবেরেলীতে সোয়া এক বছর বা এর কিছু বেশি সময় খান ছাহেবের মাদরাসায় ঐ সব শিশুর উস্তায হিসেবে ছিলাম। মুস্তফা রেযা ছাহেব এবং হামেদ রেযা ছাহেব দুই ভাই ছিলেন। মাওলানা আহমাদ রেযা খান ছাহেব ঐ সময় জীবিত ছিলেন। মুসতফা রেযা আমার নিকট পড়েছে। যেহেতু তর্ক বিতর্ক থেকে আমি সব সময় দূরে দূরে থাকতাম, এ জন্য আমার সাথে কখনো কারো বিতর্ক হয়নি।

মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব লুধিয়ানভী রহ. একবার আমাকে শোনাচ্ছিলেন যে, আমার মেয়ে যেহেতু ঐখানে ছিল এজন্য আমার সেখানে যেতে হত। মাওলানা হামেদ রেযা খান ছাহেবের সাথে মিলার সুযোগ হয়েছে। মুসাফাহা তো উনি করে নিয়েছেন, কিন্তু তাহকীকের পর তিনি জানতে পারেন যে, আমি হাবীবুর রহমান লুধিয়ানভী। তখন উনি বললেন যে, এ তো কাফেরের (?) সাথে মুসাফাহা হয়ে গেল!

আমার একজন আত্মীয় ঐ মহল্লাতেই থাকতেন। তিনি এটা শুনে খুব মর্মাহত হলেন। তিনি পরের দিন ঐ মহল্লাতেই আমার ওয়াযের ব্যবস্থা করলেন। রাতে আমি বয়ান করলাম যে, পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ কেন সত্যপন্থী রাসূলের সত্যায়ন করেনি। হয়ত তাঁকে খোদা আখ্যায়িত করেছে যেমন খ্রীস্টানরা। অথবা তাকে মিথ্যুক পর্যন্তও বলেছে। ইরশাদ হচ্ছে :

مَآ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ أَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُوْنَ

অর্থাৎ, " তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ আর রহমান (আল্লাহ) কিছুই নাযিল করেননি। নিশ্চয়ই তোমরা মিথ্যা বলছ।" (সূরা ইয়াসীন : ১৫)

এদিকে আমরা বলছি, যে নবীকে "বাশার" বা মাটির তৈরী মানুষ বলবে সে কাফের! অথচ এটা কুরআনে কারীমের আয়াতকে সাফ অস্বীকার করার নামান্তর।

আকীদা বিষয়ক গ্রন্থসমূহে লিখেছে : اَللّٰهُ أَرْسَلَ بَشَرًا إِلٰى بَشَرٍ "আল্লাহ তাআলা মানুষকে মানুষের নিকট রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন।" কেননা এক জাতের হলেই পরস্পর মিল মহব্বত হয় এবং ফায়েদা পৌছানো ও ফায়েদা গ্রহণ করা সহজ হয়।

মোটকথা, বয়ানের উপস্থাপনা অনেকটা এমন হয়েছে যে, তারা সবাই লা জবাব হয়ে গেছে। আমার ঐ আত্মীয় বলছিলেন যে, মৌলভী হামেদ রেযা ছাহেব নাকি বলেছেন যে, বয়ান তো ভালই করেছেন।

মাওলানা হাবীবুর রহমান লুধিয়ানবীর এ কথা শুনে আমিও খুব খুশী হলাম।

অধম সংকলক আরয করছে যে, একবার হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. লায়েলপুর তাশরীফ এনেছিলেন। তো বসামাত্রই বললেন যে, আপনাদের মৌলভী সরদার আহমাদও বেরেলী যাওয়ার সময় এ বগিতেই সফর করছিলেন। যেটাতে আমরা ছিলাম। আমাদের সাথে তো বিতর্কে জড়ানোর মত কোন কথা উনি বলেননি। ভালই ছিলেন। অথচ আমি এখানে কয়েকবার এসেছি। আমাকে খুব ভালভাবে চিনতেনও বটে।

আমি অধম (সংকলক মুহাম্মাদ লায়েলপুরী রহ.) আরয করলাম যে, উনি তো আমার মহল্লাতেই থাকেন। আমার সাথেও কখনো তর্কে জড়াননি। আমার বয়ানের সময় কখনো মূল মাসআলার বাইরে যাইনি। কারো নাম নিয়ে

কখনো সমালোচনা করি না। এ কারণেই আমার মাদরাসায় তাদের (বেরেলীদের) শত শত ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা করে। লোকেরা আমার সম্পর্কে বলেছে সে তো দেওবন্দী। এবং কট্টরপন্থী দেওবন্দী। কিন্তু সে কাউকে মন্দ বলে না। শুধু মাসায়িল বয়ান করে।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন : কখনো কারো সাথে তর্কে জড়িয়োনা। যারা অযথা বিতর্কে জড়ায়, এরা নিজেদেরই ক্ষতি করে। যদি "তামীর" বা গঠন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটাই নিরাপদ পথ। আর যদি উদ্দেশ্য হয় ভাঙ্গন ধরানো, তাহলে যার যা মর্জি করুক। আপনি এতে শামিল হবেন না। এর মধ্যেই কল্যাণ। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের আ. তাবলীগের পদ্ধতি এটাই ছিল।

মাওলানা ইবরাহীম ছাহেব বললেন : এ তো কাউকে কিছু বলেও না। হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এটা শুনে বললেন : সে খুব ভাল কাজ করছ। মানুষ তো মানবে না জানা কথাই। তাহলে খামোখা তামাশা দেখানোর দ্বারা কী লাভ?

আমি অধম আরয করলাম যে, হযরত আনওয়ার শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ. দেওবন্দ থেকে কোন ছাত্রকে বিদায় দেয়ার সময় এই বলে অসিয়্যত করতেন যে, কারো সাথে তর্কে জড়াবে না। সর্বসম্মতিমূলক মাসায়িল বর্ণনা করবে। আর মৌলিক কথাবার্তাসমূহ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবে। ইনশাআল্লাহ মানুষের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এরপর যখন লোকেরা তোমার ভক্ত হয়ে যাবে, তখন তুমি যা বলবে, তারা তাই মেনে নিবে।

তবে হ্যাঁ মির্যায়িয়্যত বা কাদিয়ানীদের ব্যাপারে হযরত শাহ ছাহেব রহ. খুব বেশি সাবধান করতেন এবং বলতেন যে, এ ফিতনার দ্বারা দ্বীনের যে ক্ষতি হয়েছে, অন্য কোন ফিতনার দ্বারা এত ক্ষতি হয়নি।

৩৯. ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তে হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর অবস্থা

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলতেন : যে দিন হযরত শাহ ছাহেব রহ. এর ইন্তিকাল হল। আমরা সফরে ছিলাম। দেওবন্দে হযরতের জানাযায় পৌঁছতে পারিনি। শুনেছি যে, সকাল বেলা সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে বাচ্চাদের সাথে খুব হাস্য রসিকতা করছিলেন। সবাই খুশী ছিল যে, আজ

আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে হযরতের তবিয়ত ভাল। রাত বারোটা পর্যন্ত তবিয়ত ভাল ছিল। অতঃপর খারাপ হয়ে গেল। পানি তলব করলেন : খাদেম পানি দিল। বললেন : আমাকে উঠিয়ে দাও। টেক লাগিয়ে খানা খাওয়া সুন্নাতের খেলাফ। পানি পান করে শুয়ে পড়লেন এবং কিবলামুখী হয়ে গেলেন আর কিছু পড়তে লাগলেন। মৌলভী মাহফূয আলী ছাহেবকে সংবাদ দেয়া হল। তিনি আসলেন তখন হযরত বলছিলেন حَسْبُنَا اللّٰهُ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এরপরই রূহ উড়ে চলে গেছে। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

মুহূর্তের মধ্যে সারাদেশে খবর ছড়িয়ে পড়ল। মোটামুটি রাত একটার দিকে হযরত ইন্তিকাল করেন।

জানাযার পর শরীর মুবারক এমনভাবে নরম ছিল যেমন জীবিত মানুষের হয়ে থাকে। চেহারা মুবারকে নূরের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল।

মাদরাসা মাযাহেরুল উলূম এবং সাহারানপুর শহর থেকে হাজার হাজার মানুষ জানাযায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে দেওবন্দ গিয়েছে। হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা রহ. মাদরাসার নাযেম হযরত মাওলানা আব্দুল লতীফ ছাহেব এবং সমস্ত শিক্ষকবৃন্দ গিয়েছেন।

জানাযার নামায মাওলানা সায়্যিদ আসগার হুসাইন দেওবন্দী রহ. পড়িয়েছেন। যেখানে হযরতের কবর বানানো হয়েছে সেখানে অধিকাংশ সময় মাগরিবের পরে দেখা গেছে যে, হযরত মুরাকাবায় বসে আছেন।

আল্লাহর ওলীদের অবস্থা অধিকাংশ সময় এমনই হয়। যখন তাঁরা পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেন, তখন এমন হাসিখুশী থাকেন।

خرّم آں روز کزیں منزل ویراں بروم + راحت جاں طلبم شاداں وفرحاں بروم

অর্থাৎ, আমি সেদিনই খুশী হব যেদিন আমি এই বিরানভূমি তথা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব। প্রাণের শান্তি ও মনের ফূর্তি আমার তখনই নসীব হবে।

৪০. এমনভাবে যিকির করতে হবে যে, আমার সারা শরীর আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকে

একদিন দুপুরে হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. আরাম করছিলেন। আমি হযরতের পা দাবিয়ে দিচ্ছিলাম। আমি আরয করলাম। হযরত! আমার সারা শরীরে একটা গরম ভাব অনুভূত হচ্ছে। আর এ অবস্থাটা সাময়িক নয় বরং স্থায়ী হয়ে গেছে। হযরতওয়ালা রহ. বললেন : এটাকেই "আনওয়ারাত" বলা

হয়। এখন আপনি শুধুমাত্র যোগসূত্র ঠিক রাখার জন্য যিকির জারী রাখবেন। স্রেফ পাঁচ তাসবীহ বা সাত তাসবীহ আদায় করবেন। আমিও এটাই করি। বেশি উচ্চস্বরে যিকির করার প্রয়োজন নেই। আর এমনভাবে যিকির-শোগল করবেন যে, আপনার সমস্ত শরীর আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকবে এবং আপনি শুনতে পাবেন। পরবর্তীতে হযরত আকদাস এটাও ছাড়িয়ে দিয়েছেন। শুধুমাত্র 'মুরাকাবা' ও 'শোগল' জারী রাখতে বলেছেন।

৪১. নিজেকে সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট মনে করাই হল তাসাওউফের উদ্দেশ্য

একবার হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. রায়পুরেই ছিলেন। আমি অধম (সংকলক) আরয করলাম যে, হযরত! অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভাল মনে হয় আর নিজেকে খুব খারাপ মনে হয়।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন : এটাই তো তাসাওউফের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাসাওউফ এর সর্বশেষ স্তর হল নিজের নিকৃষ্ট হওয়া একদম সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এটা শুধু কথার মধ্যেই সীমিত থাকবে না। বরং হাল বা অবস্থা বনে যেতে হবে যে, আমি সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট।

৪২. আল্লাহর পথের পথিকের বিশেষ অবস্থা

একবার আমি (সংকলক) রায়পুরে উপস্থিত ছিলাম। আরয করলাম যে, হযরত যখন আমি বসি, তখন মনে হয় যেন ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। হযরতওয়ালা রহ. বললেন : মুবারক হোক। অতিসত্তর আপনার বাতেনী অবস্থায় নূরের বর্ষণ হবে ইনশাআল্লাহ। এটা হল নূরের বৃষ্টি।

৪৩. শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী রহ. এর বিস্ময়কর কাহিনী

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : আমাদের হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব রায়পুরী রহ. পীরানে কালয়ারে (একটি স্থানের নাম) গমন করেছিলেন। উরসের উদ্দেশ্যে নয়। এমনিতেই সেখানে তাশরীফ নিয়ে যান।

হযরত বলেন : বসন্ত মৌসুম আরম্ভ হয়েছিল। শীত মৌসুম মাত্র বিদায় নিয়েছে। ভেতরে শয়ন করলে মশা কামড় দেয় আর বাইরে শয়ন করলে শীত লাগে। আমি বাইরের চত্তরেই ফরাশের উপর বিছানা লাগালাম। রাতে খুব বৃষ্টি হল। আমি মনে মনে বললাম : কে উঠবে? লেপ দিনের বেলা শুকিয়ে

নিব। যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠলাম, তখন মসজিদের ফরাশ সম্পূর্ণ শুকনো ছিল! আর লেপও শুকনো!! আসলে এগুলো ছিল নূরের বৃষ্টি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওযায়ে মুতাহহারায় সালাম পেশ করার সময় নূরের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। প্রত্যেকটি মানুষ সেটা অনুভব করতে পারে।

কাবা শরীফ তাওয়াফ করার সময়ও এমন নূরের বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

অতঃপর আওয়ায আসল : আব্দুর রহীম! আমি উত্তর দিলাম : জ্বী হ্যাঁ, কিছুক্ষণ পর আবার আওয়ায আসল : আব্দুর রহীম! আমি উত্তর দিলাম : জ্বী হ্যাঁ, আমি উপস্থিত। অতঃপর তৃতীয়বার আওয়ায আসল : আব্দুর রহীম! আমি আরয করলাম আপনি কোন বুযুর্গ? আপনাকে তো দেখা যাচ্ছে না। বললেন : আমি আলী আহমাদ, আপনার কিসমত গাঙ্গুহে।

আমি সকালে রায়পুর চলে আসলাম। পরবর্তীতে যখন হজ্বে গেলাম, তখন হযরত হাজী ছাহেব রহ. জীবিত ছিলেন। হাজী ছাহেব রহ. আমাকে বললেন : তুমি ফেরার সময় আমার সাথে সাক্ষাত করে যেও। আমি উপস্থিত হলাম এবং বললাম যে, আজ দেশে চলে যাওয়ার খেয়াল। একটি চিঠি দিলেন আর বললেন যে, যখন তুমি গাঙ্গুহ যাবে, তখন এ চিঠিটি মৌলভী রশীদ আহমাদের কাছে দিও।

দেশে ফেরার পর আমার আর গাঙ্গুহ যাওয়ার কথা মনে থাকেনি। একদিন হঠাৎ খেয়াল আসল যে, চল গাঙ্গুহ ঘুরে আসি।

আমি যখন গাঙ্গুহ পৌঁছলাম তখন হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. যুহরের নামাযের জন্য উযু করছিলেন। হযরত বললেন : এসে গেছ? আমি আরয করলাম যে, হাযির হয়ে গেছি। অতঃপর বললেন যে, আমার নামে কি কোন চিরকুট হযরত হাজী ছাহেব রহ. তোমায় দিয়েছিলেন? দারুণ লজ্জিত হয়ে উত্তর দিলাম যে, হযরত তো দিয়েছিলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন : আমার এখানে কতদিন অবস্থান করবেন ? আমি আরয করলাম : তিন রাত। অতঃপর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. আমাকে বাইআত করে নিলেন। এবং চারো তরীকায় আমাকে ইজাযত দিয়েছেন।

৪৪. প্রসঙ্গ : যিকিরের সময় কুরআনে কারীমের আওয়ায আসা

জনৈক বুযুর্গ আরয করেন যে, আমি যখন যিকির করি, তখন কুরআনে কারীমের আওয়ায আসে, তাহলে কি এটাই 'যিকরে সির বা গোপন যিকির'

প্রতি উত্তরে হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন : না, এটা হল “সুলতানুল আযকার” বা সমস্ত যিকিরের রাজা। কিন্তু রূপক অর্থে।

৪৫. সংকলক এবং রায়পুরী রহ. এর মধ্যকার একটি ঘটনা

এই অধমকে হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. একবার শুরু যমানায় আম্বালা শহরে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর বললেন যে, “জুমুআ পড়াও”। আমি হযরতের নির্দেশ পালন করলাম। বয়ান করলাম। সন্ধ্যায় আমার ফেরার কথা ছিল। হযরত বললেন : আমি নিজে আপনাকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিতে ষ্টেশন পর্যন্ত যাব। ষ্টেশনে পৌঁছে আমাকে গাড়ীর ভাড়া পর্যন্ত বের করে দিলেন। আমি আরয করলাম : আমার কাছে যা কিছু আছে, সেটাও তো হযরতেরই দেয়া। এরপর বললেন : এই নাও তোমার টিকেটও নিয়ে এসেছি।

পরবর্তীতে লাহোর শহরে সায়্যেদ মুহাম্মাদ জামীল ছাহেবের কুঠিতে কিছু টাকা দিয়েছেন আর বলেছেন যে, তুমি নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে না। এগুলো আমি আমার পক্ষ থেকে দেই না। সব আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

৪৬. বুযুর্গানে দ্বীনের সান্নিধ্যের বরকত

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের সান্নিধ্যের প্রভাব যে কত ভাল, তা বুঝানোর জন্য এই কবিতাগুলো প্রায় সময় পাঠ করতেন :

گل خوشبوئے در حمام روزے + رسید از دست محبوبے بدستم
بدو گفتم کہ مشکی یا عنبری + کہ از بوئے دل آویزے تو مستم
بگفتا من گل ناچیز بودم + ولیکن مدتے با گل نشستم
جمال ہمنشیں در من اثر کرد + وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

একদিন গোসলখানায় একটি সুগন্ধীযুক্ত মাটির ঢিলা আমার প্রেমাস্পদের হাত হয়ে আমার হাতে পৌঁছল। আমি তাকে বললাম : তুমি কি মিশক নাকি আম্বর? তোমার সুঘ্রাণে তো আমি মাতাল হয়ে যাচ্ছি। সে বলল : আমি তো এক অস্তিত্বহীন মাটির ঢিলা ছিলাম। তবে দীর্ঘ সময় আমি ফুলের সাথে ছিলাম। আমার সাথীর সৌন্দর্য আমার মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। নতুবা আমি যে মাটি ছিলাম সেই মাটিই আছি।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলতেন : এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রাণহীন জিনিসের মধ্যেও সান্নিধ্যের প্রতিক্রিয়া হয়।

৪৭. হযরতের কাব্যচর্চা

আমি (সংকলক) যখন প্রথমবার রায়পুর উপস্থিত হই, তখন বাদ মাগরিব হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এর খেদমতে বসা ছিলাম। হযরত খুব প্রফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। ঐ সময় তিনি সুলতান বাহুয়া রহ. এর কয়েকটি কবিতাও পাঠ করেন।

৪৮. কালিমায়ে তায়্যিবার প্রভাব

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : হযরত সুলতান বাহুয়া (রহ.)কে হাজী আব্দুর রহমান ছাহেব মাজযূব রহ. ইজাযত দিয়ে বিদায় করেন। ফলে তিনি দিল্লী থেকে শোরকোটের দিকে চললেন। পীর ছাহেব বললেন : রাস্তায় কারো সাথে কথাবার্তায় জড়াবে না। যখন হযরত ভাণ্ডা নামক স্থানে আসলেন, তখন দেখলেন যে, একজন হিন্দু যোগী রাস্তায় বসে আছে আর কথাবার্তার মাধ্যমে নিজের দিকে আকৃষ্ট করছে। সে জিজ্ঞেস করল। হে যুবক! কোথায় যাচ্ছ? হযরত বললেন : আমি তো শোরকোট যাচ্ছি। এটা বলে সামনে অগ্রসর হলেন। বলেন যে, দু-চার কদম সামনে চলার পর মনে হল যে, বুকের মধ্যে অন্ধকার প্রবেশ করছে। আর ঈমানের নূর বের হয়ে যাচ্ছে। আমি এটাই বুঝলাম যে, নিশ্চয়ই এটা ঐ যোগীর ষড়যন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দিকে ফিরলাম আর ঐ যোগীর সামনে এসে লাঠি ঘুরিয়ে প্রচণ্ড আওয়াযে لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলে উঠলাম, যেমন কাদেরিয়্যাহ সিলসিলায় জোরে যরব লাগানো হয়। ঐ যোগী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাজারের দিকে পলায়ন করল আর বলল : লোক সকল! ওখানে বাইরে এক মুসলমান এসেছে। সে বলছে لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ পুরো বাজারে لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর যিকির হতে লাগল।

এদিকে হযরত হাজী আব্দুর রহমান ছাহেব রহ. কাশফের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, তাঁর শিষ্য রাস্তায় কথাবার্তায় জড়িয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পেছনে টানলেন এরপর নিজের কাছে দিল্লীতে এক বৎসর রাখলেন। বললেন : আমি কি তোমাকে বলিনি : “কারো সাথে জড়িয়ে পড়ো না।”

সার কথা এটাই, এই হল আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের সান্নিধ্যের প্রভাব। ঐ যোগী ষড়যন্ত্র করল অথচ কালিমায়ে তায়্যিবার মাত্র এক যরবেই পুরো চিত্র পাল্টে গেল।

তাঁকে "সুলতান বাহুয়া" এজন্য বলা হয় যেহেতু তিনি هُوَ (সে) খুব বেশি জপেছিলেন। অর্থাৎ "হুয়া ওয়ালা বাদশাহ"।

কাদেরিয়্যাহ তরীকায় هُوَ هُوَ যিকিরও প্রচুর পরিমাণে করা হয়।

৪৯. 'জায্‌ব' বা আকর্ষণ কাকে বলে?

শুরু শুরুতে যখন আমি অধম রায়পুর হাযির হতাম, তখন এমন অবস্থা হত যে, কেমন যেন শরীরে জ্বর চড়ে আছে, একদিন মাগরিব নামাযের পর আরয করলাম যে, এমনটি হচ্ছে।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন : খুব মুবারক হালত। এটাকে তাসাওউফের পরিভাষায় 'জায্‌ব' বা বিশেষ আকর্ষণ বলা হয়।

৫০. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. ও মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরীর রহ. মধ্যে পরস্পর মহব্বত

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর আমাদের শাইখ হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী রহ. এর সাথে খুবই আন্তরিকতা পূর্ণ সম্পর্ক ছিল। প্রায় সময় কাশ্মীরী রহ. রায়পুর আগমন করতেন।

আমি অধম আরয করলাম যে, হযরত শাহ ছাহেব রহ. বলতেন : একবার হযরত শাহ আব্দুর রহীম রহ. দেওবন্দ আগমন করেন। আমাকে বললেন যে, এ সফর তো আমি এ জন্য করেছি যে, আপনাকে দারুল উলূম দেওবন্দের রোকন বানাতে হবে।

৫১. হযরত রায়পুরী রহ. এর দয়া ও মায়া

আমি (সংকলক) একবার রায়পুর উপস্থিত ছিলাম। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছিল। আমি বাজার থেকে হাজী যাফরুদ্দীন ছাহেবকে পয়সা দিয়ে ঔষধ আনিয়ে নিতাম। আর এ ব্যাপারটা হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ.-এর নিকট গোপন রাখতাম। একদিন আমার হুজরায় যা হযরতওয়ালার হুজরা মুবারকের সাথে সংলগ্ন ছিল আগমন করলেন। বললেন যে, "আমার নিকট সিরাপ রাখা আছে, সেটা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। এটা যত্ন সহকারে পান করবে, ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবে। আর মৌলভী আব্দুল আযীয ছাহেবের নিকট

ঔষধসমূহের স্টক থাকে, সেটা তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি, সেটাও নিয়ে নিও। সেটা যাকিরীনের জন্যই। অতঃপর সমস্ত ঔষধের নাম বললেন আর বললেন যে, সব ঔষধ এখানে বিদ্যমান। তুমি বাজার থেকে কোন ঔষধ আনাবে না।"

৫২. হযরত রায়পুরী রহ. এর দয়া মায়ার একটি ঘটনা

আমি মনে মনে শপথ করেছিলাম যে, খানকার বেষ্টনী বা বেষ্টনী সংলগ্ন স্থানে ইসতিন্‌জা করব না। এটা খেলাফে আদব তথা শিষ্টাচার পরিপন্থী কাজ। দূরে যাওয়া উচিত। এর উপরই আমল করছিলাম। আমার জ্বর আসার পর হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. খুব জোর দিয়ে বাইরে ইসতিন্‌জার জন্য যেতে নিষেধ করে দিলেন আর বললেন যে, তুমি যেহেতু মাযূর (অপারগ) তাহলে তুমি এত কষ্ট কেন করবে?

৫৩. হযরতের সাথে রেলগাড়ীর সফরে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা

আমি হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এর সাথে রেলগাড়ীর সফরে থাকলে হযরতওয়ালা ভাই আলতাফুর রহমানকে বলতেন যে, মাওলানা (সংকলক মাওলানা মুহাম্মাদ ছাহেব আনওয়ারী রহ.)কে উযূ করাও। আমি দারুণ লজ্জিত হতাম। বলতেন যে, না সে তোমাকে উযু করাবে। হযরতের এ সব দয়ামায়া আর স্নেহের কথা মনে পড়লে এখন রক্ত অশ্রু আসে। এমন স্নেহশীল মুরব্বী। আমি কয়েকবার আরয করেছি যে, আমরা যত অযোগ্য অতই হযরত আমাদের প্রতি মেহেরবান। এটা শুনে হযরত বলতেন : তাওবা তাওবা।

৫৪. বুযুর্গানে দ্বীন সব সময় ছোটদের প্রতি খেয়াল রেখে থাকেন

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. একবার লাহোরে বললেন : তুমি যখনই আসবে, নিঃসঙ্কোচে আমার কাছাকাছি বসবে। দিল্লী বা সাহারানপুরের সফর হলেই আমি অধমের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে বলতেন যে, তুমিও এসে পড় আমি দিল্লী বা সাহারানপুর যাচ্ছি। এরপর আমার ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনের সামনে এমনভাবে কথাবার্তা বলতেন যে, ঐ সব হাযারাতও এ অযোগ্যের ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন। বর্তমানে তো কারো সাথে কথা বললেও স্বীয় প্রশংসা মনে করা হয়। এই স্নেহই হযরত মুহাদ্দিসুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর ছিল।

৫৫. হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এর সাথে মাসূরী পাহাড়ে ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত

একবার হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. মাসূরী পাহাড়ের উপর (ভারতের অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান) তাশরীফ নিয়ে গেলেন। হযরত আমাকেও সেখানে ডেকে নিলেন। বললেন যে, "তুমি এখানে চলে আস"। সাহারানপুর পৌঁছার পর আরো সাথী আমাদের সাথে জুড়ে গেলেন। যারা হযরতের খেদমতে গিয়েই অবস্থান করতেন। আসর নামাযের পর হযরত বৈকালিক ভ্রমণে বের হতেন। আমরাও হযরতের সঙ্গে থাকতাম।

হযরত রহ. বলতেন : রাসাওয়াত বৃক্ষ (তিক্ত ঔষধী গাছ) এখানে প্রচুর পরিমাণে আছে। এর ফুল চোখের অসুস্থতার জন্য অব্যর্থ মহৌষধ। ছিঁড়ে খেয়ে নাও। আমি সেখানে তেরো দিন হযরতের খেদমতে ছিলাম। দৈনিক ঐ ফুলটি খেতাম। আলহামদুলিল্লাহ! চোখের ব্যাধি থেকে নিরাপদ ছিলাম। আর চোখের পূর্ববর্তী যে সব সমস্যা ছিল, সেগুলো আর দেখা যায়নি।

ঐ মাসূরী পাহাড়ে থাকা অবস্থায় জুমুআর দিনও চলে আসল।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন : "জুমুআর নামাযের জন্য শহরের মধ্যে মসজিদ থাকাও শর্ত।" আমি অধম (সংকলক) বললাম যে, আদদুররুল মুখতার গ্রন্থে তো লিখেছে :

وَتُؤَدّٰى فِيْ مِصْرٍ وَاحِدٍ بِمَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ

অর্থাৎ, "একই শহরের একাধিক স্থানে জুমুআহ আদায় করা যাবে।"

আর ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন যে, মসজিদ শর্ত নয়।

এ কথাগুলো শোনার পর হযরতওয়ালা রহ. বললেন : ব্যস, আমরা তো এখানেই পড়ে নিব। 'ইযনে আম' বা সাধারণ মানুষের প্রবেশের অনুমতি থাকতে হবে। অতএব যদি আযান দিয়ে দেয়া হয়, আর দরওয়াযা খুলে দেয়া হয়, তাহলে যে কেউ এসে নামাযে শরীক হতে পারে। তাহলে ব্যস, যথেষ্ট হয়ে যাবে। আমি অধম আরয করলাম যে, জ্বী হযরত! যথেষ্ট হবে।

অতঃপর বললেন যে, "ব্যস তুমিই জুমুআহ পড়িয়ে দাও"।

হযরতের অবস্থানস্থল ছিল দুই পাহাড়ের মাঝখানে। এ জন্য সেটাকে "হিল জংশন" বলা হত।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন : বাজার থেকে দুধ পান করা ঠিক নয়। কেননা এখানের হিন্দুরা গরুর পেশাব ঢেলে দুধ নিয়ে আসে। যেটা নাপাক। আর এরা এটাকে পবিত্র মনে করে।

যেদিন বিদায় নেয়ার দিন ছিল, সেদিন বললেন যে, "আজকে তুমি চলে যাও"। হাফেয আব্দুল কাদীর ছাহেব পীড়াপীড়ি করে বললেন যে না হযরত! ইনি আগামীকাল যাবেন। হযরত বললেন : যদি সে সময়মত তাঁর স্কুলে পৌঁছতে পারে, তাহলে আমি আপনার কারামত মনে করব। পরের দিন ফজরের নামাযের পর আমি এবং চৌধুরী আব্দুল খালেক উভয়ে রওয়ানা হলাম। হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. তাঁকে বলে দিলেন যেন রাস্তায় আমার খেদমত করে। চৌধুরী সাহেব বাস্তবেই আমার অনেক খেদমত করেছেন। মীর গাওহার আলী সেখানে মোটর চালাতেন। দেরাদুন শহরে অবস্থান করতেন। তিনি আমাদেরকে সাহারনপুর ষ্টেশন পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সময়মত রায়কোট স্কুলে পৌঁছতে পারিনি। এটা হযরতের কাশফ ছিল।

৫৬. হাদীসের শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখাও জরুরী

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে যখন আমি অধম (সংকলক) ঢাডী শহরে উপস্থিত হলাম। তখন হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. দারুণ আনন্দিত হলেন আর বললেন যে, তোমারই অপেক্ষা করছিলাম। আমি আরয করলাম যে, 'মিল্কওয়াল' ষ্টেশন থেকে ভুলে খোশাবগামী গাড়ীতে উঠে পড়েছি। যখন 'হিরণপুর' ষ্টেশন আসল, তখন আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'বাহীরাহ' কখন আসবে? উনি বললেন : বাহীরাহ এখানে কোথায়? এই গাড়ী তো 'খোশাব' যাচ্ছে। আমি হতবাক হয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি বললেন যে, আপনি এখানেই নেমে পড়ুন। এখনই একটি রেলগাড়ী আপনাকে 'মিল্কওয়াল' নিয়ে যাবে।

আমরা দুজন মানুষ ছিলাম। মিল্কওয়াল ফিরে আসলাম। তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। বাজার থেকে খানা খেলাম। মসজিদ নিকটেই ছিল। ইশার নামায পড়ে মসজিদেই বিছানা ফেললাম যে, এখানে আরাম করব। মসজিদের ইমাম ছাহেব আমাদেরকে মসজিদের দোকানে স্থান করে দিলেন। দুটি চারপায়ী মিলে গেল। ডিসেম্বরের ২৭তম তারিখ ছিল। প্রচণ্ড শীত ছিল। শীতের কারণে ঘুম আসেনি। পরিশেষে ক্লান্ত হয়ে উযূ করে নিয়েছি এবং নামাযের

নিয়্যত বেঁধে ফেলেছি। আমার সফরসঙ্গীর জ্বর এসে গেল। আযান হলে পরে আমরা মসজিদে চলে গেলাম। আর এক কিনারে সামান রেখে দিলাম। মসজিদের ইমাম কোন বিদআতী আলেম ছিলেন। ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা দরসও শুনলাম। রৌদ্র উঠার পর ষ্টেশন চলে আসলাম। গাড়ী চলল। বাহীরার ষ্টেশন আসল। আমরা নেমে টাঙ্গা ভাড়া করলাম। একজন মানুষকে বললাম : আমাদেরকে ঢাডীতে পৌঁছে দিও। সে আমাদেরকে হযরতের মসজিদে ছেড়ে গেল।

যখন আমি পুরা সফরনামা শোনালাম তখন হযরত রায়পুরী রহ. খুব খুশী হলেন। বললেন যে, আরেকটা ঢাডী জেহলাম জেলাতেও আছে। ভাল হয়েছে যে, তুমি খামুশ থেকেছ। নতুবা লোকেরা এমন বিদআতী যে, বিরোধীদেরকে মারধর পর্যন্ত করে।

অতঃপর আমি বললাম যে, এ এলাকার লোকজন খুব ভাল। আমরা রাস্তা জিজ্ঞাসা করলে এ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে এবং দুআ সুলভ শব্দ বলছিল। "আল্লাহ ঈমান দেন।" "হায়াতী হোক" ইত্যাদি।

আমাদের ওখানে ব্যাপার হল এই যে, কাউকে রাস্তা জিজ্ঞাসা করলে বলে দেয় যে, সোজা চলে যাও। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে বলে যে, তুমি কি অন্ধ? তোমার কি চোখ নেই? এটা শুনে হযরত খুব হাসলেন।

আমি প্রায় এক মাসের কাছাকাছি সেখানে অবস্থান করেছি। দৈনিক হাঁটতে বের হতেন। ইশার নামাযের পর দৈনিক আমি মসজিদ থেকে বিলম্বে বের হতাম। তখন হযরত আকদাস শুয়ে পড়তেন। আর মিয়া ইমামুদ্দীনকে দু'আসমূহ মুখস্থ করাতেন। আলহিযবুল আযম এবং দালায়িলুল খাইরাতের সমস্ত দুআ ও দুরূদ শরীফ মুখস্ত ছিল।

এক রাতে ইশার নামাযের পর যখন আমি উপস্থিত হলাম, তখন এই দুআ বলাচ্ছিলেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىٓ أَسْلَمْتُ وَجْهِىْ إِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِىْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَّ رَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ
وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَ نَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ۔

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আমার চেহারা (আত্মাকে) আপনার নিকট সোপর্দ করলাম এবং আমার সকল কর্ম আপনার উপর সোপর্দ করলাম এবং

আমি আমার পৃষ্ঠ আপনার নিকট অর্পণ করলাম। আপনার রহমতের প্রত্যাশায় এবং আপনার আযাবের ভয়ে। আর আপনার রহমতের আশ্রয় ও পানাহ ছাড়া অন্য কোন আশ্রয়স্থল নাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান আনলাম এবং আপনার প্রেরিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনলাম। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ২৪৭)

এই হাদীসের বর্ণনকারী হযরত বারা ইবনে আযিব রাযি. বলেন : যখন আমি দ্বিতীয়বার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দুআ শোনাচ্ছিলাম, তখন আমি وَ نَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ বলার পরিবর্তে وَ رَسُوْلِكَ বলে ফেলি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : না وَ نَبِيِّكَ الَّذِىْ أَرْسَلْتَ বলবে।

সুবহানাল্লাহ! মুবারক শব্দসমূহ হেফাযত করার এমন গুরুত্ব ছিল।

বর্তমানে কোন কোন হাদীস অস্বীকারকারী বলে যে, এসব হাদীস কীভাবে মুখস্ত হয়ে গেছে?

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরাম রাযি.কে উজ্জ্বল মেধাশক্তি ও শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন যে সব কিছু মুখস্ত হয়ে যেত।

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. কাসীদা শুনে পুরো কাসীদা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

হাদীস অস্বীকারের দ্বারা স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর আপত্তি উত্থাপিত হয়। নাউযবিল্লাহি মিন যালিক। এটা তো 'রিসালাত' এর পরিষ্কার অস্বীকৃতি।

৫৭. ইসলামী বিবাহ হবে সবধরনের রসম বা কুপ্রথামুক্ত

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. একদিন ফজরের নামাযের পর বললেন : তুমি খুতবা পড়ে আব্দুল ওয়াহীদের বিবাহ করিয়ে দাও। তুমিই আমাদের বংশের বিবাহ পড়ানেওয়ালা। তিন রূপিয়া মোহর ধার্য করলেন এবং বিবাহ হয়ে গেল। খানা খাওয়ার সময় বললেন যে, ওয়ালীমার নিয়্যতে খাও। যখন ঐ মেয়েটার ইন্তিকাল হল, তখন মৌলভী আব্দুল জলীলের দ্বিতীয় বোনের সাথে বিবাহ করিয়ে দিলেন। সেই সহজ সরল বিবাহ।

হযরত রহ. বলতেন : এভাবে করলে আরামে থাকতে পারবে।

যখন আমি মৌলভী আব্দুল জলীলের সাথে আমার কন্যার বিবাহের ইচ্ছা করলাম, তখন বললেন যে, তুমি নিজেই খুতবা পাঠ করে নিজেই ইজাব-কবূল করিয়ে দাও। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই করেছিলেন। যখন ঐ দিনেই হযরত আকদাস রায়পুরী রহ. এর লায়েলপুর থেকে সারগোধা রওয়ানা হওয়ার সময় সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েকেও রুখসত করে দিয়েছি, তখন বললেন : "তুমি তো কামালই করে দিয়েছে" (মানে অসাধারণ কাজ করেছ)। আমার তো খেয়াল ছিল রুখসতী পরবর্তীতে করবে। আমরা আজ যাচ্ছি, সাথে তাকেও নিয়ে যাব। অনেক দুআ দিয়েছেন।

৫৮. বুযুর্গানে দ্বীনের ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করা অনুচিত

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. একবার বললেন : যে সব বুযুর্গানে দ্বীনকে অনেক যাচাই বাছাই করা হয়েছে যে, তাঁরা সুন্নাতের পুরোপুরি অনুসরণকারী এবং বাহ্যিকভাবে শরীয়তের পাবন্দ, তাঁদের দ্বারা যদি এমন কোন কথা প্রকাশ পায় যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করছেন, তাহলে এ বুযুর্গের ব্যাপারে মন্তব্য করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করবে না বরং এমন ব্যাখ্যা করবে যে, হয়ত তাহদীসে নেয়ামত (আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতের প্রচার) হিসেবে বলেছেন, অথবা হালতের প্রাবল্যের কারণে এমনটি বলেছেন।

কোন কোন বুযুর্গ থেকে এ জাতীয় কথা প্রমাণিত আছে। কিন্তু আমাদের আকাবির হাযারাত সেগুলোর ভাল ব্যাখ্যা করেছেন। দ্রুত কোন মন্তব্য করেননি।

৫৯. কেউ যিকিরে রত থাকলে আশপাশের মানুষের কথাবার্তা বলা অনুচিত

আমি অধম (সংকলক) রায়পুরে যুহরের নামাযের পর যিকির করছিলাম। মাওলানা আবদুল্লাহ ছাহেব ফারুকী রহ. এবং আরো দু-তিন জন মানুষ বসে চা পান করছিলেন। কথাবার্তাও বলছিলেন। হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. নিজ হুজরা মুবারক থেকে উঠে আমার হুজরায় তাশরীফ আনলেন। আমি আমার যিকিরে মশগুল ছিলাম। হযরতওয়ালা বললেন : যখন কেউ যিকির করে, তখন তার আশেপাশে কথাবার্তা বলা এবং তাঁর একাগ্রতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা জায়েয নেই। এটা বলে হযরত দরওয়াযা বন্ধ করে দিলেন। ঐ সব হযরত বাইরে চলে গেলেন।

৬০. পূর্বে আল্লাহর ভয়ের প্রাবল্য ছিল, এখন আল্লাহর ভয়ের মধ্যে কমতি এসে গেছে

আমি অধম (সংকলক) আরয করলাম যে, যখন আমরা শুরু যামানায় রায়পুর হাযির হতাম, তখন প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত দেখতাম। আর এখন এর বিপরীতে প্রত্যেকে যিকির বাদ দিয়ে অন্যকেও কথার মধ্যে লাগিয়ে দেয়।

এটা শুনে হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন : "প্রথমে আল্লাহ পাকের ভয়ের প্রাবল্য ছিল, আর এখন আল্লাহ পাকের ভয়ের মধ্যে কমতি এসে গেছে। তারপরও গনীমত যে, এতটুকু তো এখনো অবশিষ্ট আছে"।

৬১. নিজ কাজে ব্যস্ত থাকবে, শাইখের কারামত তালাশে সময় নষ্ট করবে না

সূফী আব্দুল্লাহ ছাহেব জালন্ধরী মরহুম বলতেন যে, আমার সামনে কেউ একজন হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এর নিকট জিজ্ঞেস করল যে, শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী রহ. এর ব্যাপারে শুনেছি যে, তাঁর থেকে প্রচুর কারামত প্রকাশ পেয়েছে।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন : এটা তো ইলমী মাসআলা যে, কেন শাইখ জীলানী থেকে এত বেশি কারামাত প্রকাশ পেল। তোমার জন্য তো আমি শাইখ আব্দুল কাদের। ব্যস নিজ কাজে ব্যস্ত থাক। বুযুর্গদের কারামাতের তাহকীক করার দরকার নাই। বুযুর্গদের কথাবার্তা অনেক উচ্চাঙ্গের হয়। আমাদেরকে যদি আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন, তাহলে সবকিছু এসে গেল।

৬২. ইলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : যদি এমন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে শোনে, যিনি তার নিকট বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি যে, আগুন গরম হয়, তাহলে এটা 'ইলমুল ইয়াকীন'। এরপর যদি দূর থেকে আগুন দেখেও ফেলে, তাহলে এটা হবে 'আইনুল ইয়াকীন'। এরপর যদি বিশেষভাবে আগুনের গরমও অনুভূত হয় এবং এর মধ্যে আঙ্গুল রেখে দেয়, তাহলে এটা হল 'হাক্কুল ইয়াকীন'। এরপর যদি পুরো বাহু আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয় অতঃপর আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আগুনই হয়ে যায়, এটা ইয়াকীনের তারাক্কী হল। যার যোগ্যতা যতটুকু তার উন্নতি ততটুকু।

হযরত মূসা (আ.) শুনলেন যে, তাঁর সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন তিনি পাত্তা দেননি। অথচ ফরমানে খোদাওয়ান্দী শুনেছেন, ইয়াকীনও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাওরাতের ফলকসমূহ নিক্ষেপ করেননি। অতঃপর যখন স্বচক্ষে দেখেছেন, তখন ফলকসমূহও ছুঁড়ে ফেলেছেন। لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ খবর স্বচক্ষে দেখার মত বিষয় নয়। যখন মুশাহাদাহ বা চাক্ষুষ দেখা হয়েছে তখন গোস্বা আরো বেড়ে গেছে এমন কি ভাই (হযরত হারুন আ.) এর দাড়ি পর্যন্ত ধরেছেন।

‘ইয়াকীন’ বলা হয় ঐ দৃঢ়বিশ্বাসকে যা বাস্তব অনুযায়ী হয়। যদি স্রেফ এই মর্তবাই থাকে, তাহলে ‘ইলমুল ইয়াকীন’। আর যদি এর সাথে অবস্থার প্রাবল্যও থাকে, কিন্তু ঐ অবস্থার প্রাবল্যের মধ্যে জানা জিনিস অজানা জিনিস থেকে অদৃশ্য না হয় তাহলে এটা ‘আইনুল ইয়াকীন’। আর যদি এমন প্রাবল্য থাকে যে, অজানা জিনিসের উপরও প্রাবল্য আছে তাহলে এটা হল ‘হাক্কুল ইয়াকীন’।

৬৩. শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারিফাত এর মর্ম

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলেন : শরীয়ত হল পালনযোগ্য বিধিবিধানসমূহের সমষ্টির নাম। এর মধ্যে যাহেরী ও বাতেনী তথা প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত আমল এসে গেছে।

পূর্ববর্তী যুগের উলামায়ে কেরাম পারিভাষিক অর্থে ‘ফিক্হ’কে এর সমার্থবোধক মনে করতেন। যেমন ইমাম আবূ হানীফাহ রহ. থেকে ফিক্হ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَ مَا عَلَيْهَا

অর্থাৎ মানুষের এটা জানা যে, কোন্টা জায়েয আর কোন্টা না জায়েয।

এরপর পরবর্তীযুগের আলেমদের নিকট শরীয়তের যে অংশ বাহ্যিক আমলের সাথে সম্পর্ক রাখে সেটাকেই ‘ফিক্হ’ বলে। আর যে অংশের সম্পর্ক বাতেনী আমলের সাথে সেটাকে “তাসাওউফ” বলে। এই বাতেনী আমলের উন্নতিকে “তরীকত” বলে। অতঃপর এই বাতেনী বা আভ্যন্তরীণ আমলসমূহের দ্বারা দিলের ভেতর যে আলো ও স্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়। বিশেষত: আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যে মুআমালাত এটাকে “হাকীকত” বলে। আর এই

বিষয়টা উন্মোচিত হওয়াকে “মারেফত” বলে। যার সামনে উন্মোচিত হয় তাঁকে “আরেফ” এবং “মুহাক্কিক” বলা হয়।

কাজেই এ সব বিষয় শরীয়তের সাথেই সম্পৃক্ত।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই যে একটি কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, শরীয়ত শুধুমাত্র ঐ সব বিষয়কেই বলা হয়, যা বাহ্যিক বিধিবিধানের সাথে সম্পৃক্ত। এই পরিভাষা কোন আলেমে দ্বীন থেকে বর্ণিত নয়। এর দ্বারা সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়। আর তারা এমন ধারণা পোষণ করে যে যাহের ও বাতেন তথা বাহ্যিক আহকাম ও আভ্যন্তরীণ আহকামের মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক!!

হযরত শামস তাবরীযী রহ. বলেন :

شریعت را مقدم دار اکنون + طریقت از شریعت نیست بیرون

অর্থাৎ, সর্বক্ষেত্রে শরীয়তকে প্রাধান্য দাও। তরীকত শরীয়তের বাইরের কোন জিনিস নয়।

আমি অধম আরয করলাম যে, হযরত শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ. বলতেন যে, আল্লাহ পাক ও বান্দার মধ্যে যে সম্পর্ক এটাকে “দিয়ানত” বলা হয়। দিয়ানতদার ব্যক্তিকে “মুতাদায়্যিন” বলা হয়।

বান্দা যখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে যিকিরকারী হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা নিজের পরিচয় করিয়ে দেন। উদাহরণ স্বরূপ : মন নরম হওয়া, ভাল স্বপ্ন দেখা আখেরাতের চিন্তা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। পরিণাম সবকিছুরই একই। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলতেন যে, ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারী إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এ হাদীস দ্বারা আরম্ভ করেছেন।

এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, যে কথা সত্যবাদী নবী বলবেন, সেটার মধ্যে ইখলাসই ইখলাস। এ জন্য উম্মাতকেও প্রথমে নিয়্যত সাফ করে নিতে হবে যেন যাহের ও বাতেন এক হয়ে যায়।

৬৪. একটি চমৎকার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা

একবার লায়েলপুর মসজিদে আনওয়ারী সুন্নাতপুরায় উলামা-সুলাহার ইজতিমা ছিল। সায়্যিদ আতাউল্লাহ শাহ ছাহেব বুখারীও রহ. আগমন করেছিলেন। তিনি মাওলানা ইবরাহীম মিয়াঁর নিকট وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُ অর্থাৎ, আর তাঁরা ঐ নূরের অনুকরণ করে যা তাঁর সাথে নাযিল করা হয়েছে। (সূরা আরাফ : ১৫৭) এই আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন যে,

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য নবীগণ তো নিঃসন্দেহে আসমান থেকে অবতরণ করেননি। তবে হ্যাঁ আসমান থেকে কিতাব নাযিল হওয়ার আলোচনা তো পাওয়া যায়। অতঃপর এ আয়াতে কারীমার وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ "এবং তারা অনুসরণ করল ঐ নূরের যা তাঁদের সাথে নাযিল করা হয়েছিল এবং

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ

অর্থাৎ, "মানুষ এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নবীগণকে পাঠালেন সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে এবং তাঁদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন"। (সূরা বাকারাহ : ২১৩)

আয়াতে কারীমায় وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ "এবং তাঁদের সাথে কিতাব নাযিল করেছেন" দ্বারা বুঝা গেল যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম অনেক উঁচু মাকাম থেকে এসে থাকেন। কিতাব তো "লওহে মাহফূয" বা সংরক্ষিত ফলক থেকেই নবীদের (আ.) উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

এ সংশয়ের নিরসন পেশ করুন। মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম ছাহেব রহ. শাহ আতাউল্লাহ বুখারী রহ. এর এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলেন না। ফলে হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. তাঁর আলোচনা শুরু করেন। ঐ সময় আলেম উলামাগণ যে স্বাদ অনুভব করছিলেন তা কখনো ভুলার মত নয়।

হযরতওয়ালা রহ. বললেন যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর মধ্যে প্রথমে "উরূজ" বা উর্ধ্বে আরোহন হয়। অতঃপর "নুযূল" বা নিচে অবতরণ হয়। যখন নুযূল হয় তখন তাঁদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট জীবের পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হয়। যখন এই শান হয়, তখন আম্বিয়া আ. মাখলূকাতের সাথে যোগাযোগ আরম্ভ করেন।

উলামায়ে কেরাম বলেন : আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবতরণ অত্যন্ত পরিপূর্ণ ছিল। এ জন্যই অসংখ্য মানুষ তাঁর মাধ্যমে হিদায়েত পেয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে :

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا

"আর আপনি মানুষদেরকে দেখবেন যে, তারা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করছে দলে দলে।" (সূরা নাসর, আয়াত : ২)

আর আখেরাতের ব্যাপারে বললেন :

اِنِّيْ مُكَاثِرٌۢ بِكُمُ الْاُمَمَ

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব।"

সাহাবায়ে কেরামের রাযি. পরস্পরের আত্মীয়তা তথা হযরত আলী রাযি.-এর সাথে হযরত ফাতিমা রাযি.-এর বিবাহ করিয়ে দেয়া এবং হযরত উসমান যিন নূরাঈনের সাথে দুই মেয়ের বিবাহ একের পর এক করিয়ে দেয়া। হযরত সিদ্দীকে আকবার এবং হযরত ফারূকে আযম রাযি.-এর মেয়েদেরকে বিবাহ করা এসবের দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই ছিল যেন পরস্পরে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. যেহেতু কুরআন ও হাদীসের অগাধ জ্ঞান রাখতেন এজন্য হাদীসের মধ্যে এসেছে যে, আমরা তাঁকে আহলে বাইত বা নবী পরিবারের সদস্য মনে করতাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ইরশাদ করেছেন : "যে ব্যক্তি কুরআনে কারীম শিখতে চায়, সে যেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকেই শিখে।"

হযরত বেলাল রাযি.-এর নিকট মেহমানদের ব্যবস্থাপনা সোপর্দ করা এবং নির্দ্বিধায় اَنْفِقْ يَا بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلَالًا "হে বিলাল! খরচ কর আর আরশের অধিপতির কাছ থেকে কমের আশংকা কর না" বলা এবং পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন বয়সে বিবাহ করে নেয়া। যাতে করে উম্মাত পর্যন্ত পরিপূর্ণ দ্বীন পৌঁছার বন্দোবস্ত হয়ে যায়।

এ কারণেই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর মাধ্যমে ইলমে দ্বীনের অর্ধেক উম্মত পর্যন্ত পৌঁছেছে। খুলাফায়ে রাশিদীন পর্যন্ত তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন এবং মাসায়িলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আর হযরত উসামা রাযি. কে সীমাহীন স্নেহ করা যাতে ক্রীতদাসের পুত্র হওয়ার কারণে তাঁর মধ্যে হীনমন্যতা ভাব না থাকে যে, আমি নিম্ন শ্রেণীর মানুষ! এই হীনমন্যতার অনুভূতিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূর করেছেন এবং তাঁকে সিপাহসালার বানিয়ে দিয়েছেন। হযরত বিলাল রাযি.কে মসজিদ নববীর মুআযযিন বানিয়ে দিয়েছেন। হযরত আনাস রাযি.-এর সাথে অকৃত্রিম আচরণ করা এবং তাঁর জন্য দু'আ করা ইত্যাদি।

সূফী হযরতদের পরিভাষায় عروج “উরূজ’ বলা হয় هُوَ الْإِنْخِلَاعُ عَنْ صِفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَ التَّلْبِيْسُ بِالصِّفَاتِ الْمَلَكِيَّةِ অর্থাৎ মানবীয় গুণাবলী থেকে মুক্ত হওয়া এবং ফেরেশতাসুলভ গুণাবলী দ্বারা সুসজ্জিত হওয়া। এটাকে “সায়র ফিল্লাহ ওয়া ইল্লাল্লাহও” বলা হয়।

আর মাকামে নুযূল হল : মানবীয় গুণাবলীর পোষাক পরিধান করে নেয়া। এটাকে মাকাকে “তাকমীল” এবং “দাওয়াতে খালক ইলাল্লাহ” এবং “সায়র মিনাল্লাহ”ও বলা হয়।

আমি অধম (সংকলক) আরয করলাম যে, হযরত শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ. বলতেন : এ জন্যই হযরত শাইখ আব্দুর কাদের জীলানী রহ. থেকে কারামাতের বহিঃপ্রকাশ ব্যাপক আকারে হয়েছে। কেননা ‘নুযূল’ দেরিতে হয়েছে।

তখন হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বললেন : আচ্ছা, হযরত শাহ ছাহেব রহ. এটা বলেছিলেন। এ কথা তো আমারও মনের কথা। এর দ্বারা অনেক আপত্তি দূর হয়ে যায়।

আমি অধমের খেয়ালে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন এটা বলা হচ্ছে যে, নুযূলের সময় (হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার উপর যে ওহী নাযিল হয়েছে, যেটাকে কুরআনে পাক “নূর” শব্দে ব্যক্ত করেছে এটাকে ঐসব মানুষ অনুসরণ করেছেন। তো বাস্তবেই তাঁদের জন্য রয়েছে বিশাল মর্যাদা। তাঁরাই হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাযি.। এ জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মোটকথা এমন তাহকীক বা বিশ্লেষণ কোন কিতাবে দেখিনি। এগুলো হল আল্লাহ প্রদত্ত ইলম। আমাদের হযরত রায়পুরী রহ. কখনো কখনো যেগুলো প্রকাশ করতে বাধ্য হয়ে পড়েন।

وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ فَقَطْ وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

মুহাম্মাদ আফাল্লাহু আনহু
লায়েলপুর
৪ রবিউল আউয়াল ১৩৮৩ হিঃ